

২০৩০ সালের একদিন ও অন্যান্য

সূচি

একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা

এই যুদ্ধে জয়ী হতে চাই

একি অপরাধে ক্ষেপে যা তোমার

শূন্য দিয়ে তপ

সাবমেরিন সাইবার অপটিক কেবুল এবং অন্যান্য মিম

রাজনীতিতে নীতি ফিরে পেতে চাই

উল্লাস কিংবা ক্রোধ নয়- কষ্ট

আহমদ ছফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার

প্রিয় আত্মীর আলম

জয় হোক গণতন্ত্রের- জয় হোক বাংলাদেশের

'সংখ্যালঘু' নয়- বাংলাদেশের নাগরিক

বলুন দেখার বলুন

চাই অলাপ্রমাণিত নতুন প্রজন্ম

অনারকম বিজয় দিবস

২০৩০ সালের একদিন

একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা

১.

সকালবেলা একটা টেলিফোন এসেছে। যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি জানতে চাইলেন একুশে টেলিভিশনে এবারের ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানো হচ্ছে, আমি ব্যাপারটি জানি কি না। আমি জানতাম না, কাজেই টেলিফোনে তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন তৃতীয় দিন রাত সোয়া ৮টায় দেখানো হবে 'দিগওয়ালে দুহানিয়া লে যায়েঙ্গে' এবং চতুর্থ দিন বিকেল ২টায় 'কুরবানি'। আমি হিন্দি ছবি সম্পর্কে কিছুই জানি না, চিত্রতারকাদেরও চিনি না। যিনি ফোন করেছেন তিনি জানানেন, ছবিগুলো বাণিজ্যিক ছবি।

টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। অনেকদিন আমার এরকম মন খারাপ হয়নি। ধর্মাত্ম গোষ্ঠী যখন মসজিদে একজন পুলিশকে খুন করে ফেলে তখন মন খারাপ হয় না, অসহ্য ক্রোধে শরীর কাঁপতে থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সরকার যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামটিকে স্বরণীয় করার ব্যাপারে সরাসরি বাধা দেয় তখন মন খারাপ হয়।

বাংলাদেশের জন্মের একেবারে গোড়ার ব্যাপারটি, আমাদের সেই ভাষা আপোলনের তারিখটি বুক ধারণ করে যে টেলিভিশন চ্যানেলটি আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই চ্যানেলটি যখন এই দেশে হিন্দি কালাচারকে বানদের জলের মতো ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে ফ্লাভ গেটটি খুলে দিতে উদ্যত হয়েছে তখন মন খারাপ তো হতেই পারে। আমার খুব মন খারাপ।

২.

আমার খুব বেশি টেলিভিশন দেখা হয় না। কিন্তু একটা দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে টেলিভিশনের গুরুত্ব-যে কত বেশি আমি সেটা কখনো অস্বীকার করি না। টেলিভিশনে খুব সুন্দর নাটক দেখিয়েছে বা খুব চমৎকার অনুষ্ঠান হয়েছে তখন আমার খুব আনন্দ হয়। একুশে টেলিভিশনে খুব চমৎকার খবর পরিবেশন করা যে শুনে আমি আশ্রয় নিয়ে এক-দুইদিন তাদের খবর দেখেছি। আমিও তাদের, খবর পরিবেশন দেশে আনন্দ পেয়েছি। বিটিভির মাস্টারদের খবর এখন যে আর কারো কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে না, সে ব্যাপারেও আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

আমি নিজেও একুশে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। বাংলাদেশের বনামধ্যম নাট্য ব্যক্তিত্ব অলী যাকেরের 'সরাসরি' অনুষ্ঠানে আমি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেছি। আমি নিজে সেটি দেখতে পারিনি, ধারণা ছিল অনেকাংশে সেটি দেখবে না। আমার আঞ্চলিকতাসুটী উচ্চারণে টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা তনতে কার ভালো লাগবে? কিন্তু অনেকে সেটি দেখেছেন, এখনও যাকে যাকে লোকজন আমাকে পথঘাটে থামিয়ে বলে, আপনার অমুক কথাটি আমার খুব ভালো লাগেছে। একুশে

টেলিভিশনের কল্যাণে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ভাবনার কথা কত মানুষকে শোনাতে পেরেছি! বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক আবেদ বানোর একটি অনুষ্ঠানেও আমি ছিলাম, সেখানে তথা-প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছি। ছোট ছোট বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠানেও আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আমার লেখা 'বুবুনের বাবা' বইটিকে আমি নিজের হাতে নাট্যরূপ দিয়েছি, বাংলাদেশের সৃজনশীল চিত্রপরিচালক মোয়াজ্জেদুল ইসলাম সেটাকে টেলিভিশনের সিরিজ করেছেন। এটিও আমি নিজে দেখতে পারিনি কিন্তু এ দেশের বাচ্চারা দেখেছে। আমার 'হাত-কাটা রবিন' বইটিকেও নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে জুতের নাটক হিসেবে একুশে স্কিলের পক্ষ থেকে আমার লেখা 'শ্রেষ্ঠ' বইটির নাট্যরূপ দেওয়া হচ্ছে, আমি খুব অগ্রহ নিয়ে এর জন্যে সময় দিচ্ছি। টেলিভিশনে জমাট একটি ভৌতিক কাহিনী খুব চমৎকার একটি ব্যাপার।

বাংলাদেশের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে—এ রকম একটি সিডি চ্যানেল ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দেখে আমার ভালো লাগে, আমার গর্ব হয়। আমার পক্ষ থেকে যদি কিছু করার থাকে আমি সেটা করার চেষ্টা করি। একুশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিটুকু বুকে ধারণ করে যে সিডি চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে বুকে যদি মমতা না থাকে তাহলে কার জন্যে থাকবে?

৩.

দৈন উপলক্ষে সেই একুশে চ্যানেলে হিম্মি সিনেমা দেখানো হবে শুনে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি। দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য ছাড়াই হিম্মি আমাদের কালচারে অনুপ্রবেশ করে গেছে। এখন আমাদের সময় এসেছে নিজের কালচারটিকে বিকশিত করে বাইরের কালচারের মুখোমুখি হওয়ার। ঠিক সেই সময় 'হিম্মি বাংলাদেশের একটি সিডি চ্যানেল সরাসরি হিম্মি ছবি দেখানো শুরু করে, সেটি যে আমাদের ওপর কত বড় একটি আঘাত তা কি কেউ চিন্তা করে দেখেছে? আমি নিশ্চিত, কালচারের বিশ্বাস বা অর্থনীতির বড় বড় কথা বলে এটাকে গ্রহণযোগ্য দেখানোর সপক্ষে অনেক মুক্তি দেখানো সময়, কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তারা কি দেশের প্রকৃত অবস্থাটি জানি না?

হিম্মি কালচার আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, ঢাকা-মিলেট গ্রাইডেট ট্রেনটিতেও আজকাল হিম্মি গান শোনানো হয়। হিম্মি পড়তে পারে না বলে এখনও হিম্মি ম্যাগাজিন আসতে শুরু করে নি কিন্তু হিম্মিতে দেখা ও শোনার হাত রিময় আছে সেগুলো কি আমাদের নিজের কালচারকে একেবারে কোর্পাস করে ফেলেছে না? দৈন উপলক্ষে হিম্মি সিনেমা দেখানোর আয়োজন করে একুশে সিডি একাংশে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হিম্মি কালচারকে আমাদের দেশীয় কালচারের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেন। এটি হচ্ছে ভুল, এর শেষ ফলাফল হবে আমি কল্পনাও করতে চাই না কারণ আমার এক ধরনের আতঙ্ক হয়। এখন এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে কার থেকে বেশি কে হিম্মি সিনেমা দেখাতে পারে। 'শুস্কর' বজা বজা টাকা নিয়ে তৈরি থাকবেন, প্রতিদিন হিম্মি সিনেমা দেখানো হবে। আগে শুধু মাত্র ডিশ আন্টেনা এবং কেবল

টিভির সঙ্গে যুক্ত দর্শকেরা হিম্মি ছবি দেখতেন, এখন সারা বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে পথেঘাটে মানুষ এই ছবি দেখবেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এর থেকে বড় উদাহরণ আমার জানা নেই।

আমি কথাটা বলিনি আমরা কুপমজুরের মতো থাকব, বাইরের কিছু দেখব না। আমরা অবশি হিম্মি ছবি দেখব—ঠিক সেরকম তেক ছবি, ফাদাসি ছবি, ইতালীয় ছবি দেখব, সেরকম হিম্মি ছবিও দেখব। পৃথিবীর নানা দেশের নানা কালচারের সুন্দর সুন্দর ছবিতো আমরা দেখার দেওয়া হোক—আমরা অগ্রহ নিয়ে দেখব, পৃথিবীর সৌন্দর্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করব, নিজেকে বিকশিত করব। কিন্তু তাই বলে দৈন উপলক্ষে নাম উত্তরণ করতে দাঁত ভেঙে যায়, সেরকম একটি ছবি একুশের মতো বাংলা সংস্কৃতিক ঐতিহ্যটিকে নামের মাঝে মাঝে ধারণ করে রাখা একটি চ্যালেঞ্জ দেখানো হবে, সেটি তো আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না।

৪.

কাজেই একুশে টিভির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, দৈন উপলক্ষে হিম্মি ছবি দেখানোর যে ঘোষণাটি আপনারা দিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করুন। আপনারা হিম্মি ছবি বা দেখিয়ে সেখানে বাংলা কোনো অনুষ্ঠান দেখান। একুশে টিভি একটি অত্যন্ত বড় প্রতিষ্ঠান, এই দেশের অত্যন্ত বড় বড় ব্যাপারে আপনারা অবদান রাখতে পারেন। আপনারা বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন। আপনারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বড় অবদান রাখতে পারেন। মফস্বলের একটি ছোট নাট্যগোষ্ঠী দেশের জন্য বা দেশের ভালচারের জন্য গভীর মহতায় একটি নাটক করে ওল্প কিছু মানুষকে আত্মপ্রাণিত করতে পারে কিন্তু একুশে টিভির একটি অনুষ্ঠান এই দেশের কয়েক কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আবার একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দেশের কয়েক কোটি মানুষকে পিছিয়ে দিতে পারে, বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। কাজেই অনুরোধ আমাদের আপনাদের এত বড় একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেনো না।

৫.

আমি নিশ্চিত এ দেশের অসংখ্য মানুষ আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমাদের কালচারে হিম্মি ছবি অনুপ্রবেশ করে গেছে, আমরা সেটা থামাতে পারিনি। কিন্তু একটা দেশের, সমাজের, সেই দেশের কালচারের একটা আত্মমর্যদা থাকে, আমরা সেই আত্মমর্যদাটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। এই দেশের গণীজন, সংস্কৃতিবান লোকেরা, প্রমুখবিশদরা যখন যে টেলিভিশন চ্যানেল দাঁড় করিয়েছেন তারা দেশের মূল সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে একাত্ম থাকবেন, আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবেন, এটাই আমাদের স্বপ্ন। এর চাইতে বেশি কিছু নয়।

এখন আসে

২৭ মেজমাসী, ২০০১

দেখতে চাইলেন না। যে ব্যাপারটিতে এ দেশের কোটি কোটি ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত, সেই ব্যাপারটিকে জাতীয় সংসদের একজন মানুষও গুরুত্ব দিতে রাজি হলো না, এই দুঃখট আমন্ত্রণ কোথায় রাখি। এ দেশের সরকার যদি দেশের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারটিকে এতটুকু গুরুত্ব দিতেন, তাহলে কি এ ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে পারত?

মার্চ মাসের ১৫ তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেরই আমি একটি সিনিয়রের বাল্যখিলাফ যে, এ বছর নকলের সবচেয়ে বড় মতোদস্তব হবে, কারণ এটি হচ্ছে নির্বাচনের বছর। নকল ব্যাপারটি এখন এক ধরনের সামাজিক অধিকারের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার্থী তার খাবার-মা, আত্মীয়স্বজন, তার কুলের শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং তার এলাকার রাজনৈতিক নেতারা সবাই এই সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেন, এই সামাজিক ব্যাপারটি থেকে সবারই কিছু না কিছু পাওয়ার আছে। নির্বাচনের বছর এতদিনের 'ব্রিটিশ' এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেবে এত বড় ভুল তো সরকার করতে পারবে না। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আমার আশঙ্কা পুরোপুরি সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, সারা দেশে নকলের মহাওলব চলছে।

একটি দেশে শিক্ষার মান বাড়তে হলে দীর্ঘদিনের প্রকৃতি নিতে হয়। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে কোনো প্রকৃতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একটি সিদ্ধান্তের। দেশের সবচেয়ে ওপরের মহল যদি সিদ্ধান্ত করত এ বছর কাউকে নকল করতে দেবে না, তারপর কয়েক দিনের জন্য দেশের মিসিটারি, বিজিআরকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কিছু ভারী অস্ত্রহাতে বসিয়ে দিত, তাহলে কি নকলে সাহায্য করার জন্য বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতারা এগিয়ে আসতে সাহস পেত? দেশে বয়স্ক সমস্ত সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়, এমনকি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়, তার তুলনায় এটা কি আরো শক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়?

পড়াশোনা বা ছাত্রজীবী ব্যতীত কী বোঝায়, সে সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদেরাধীন যে বিদ্যুৎদ্বারা ধারণা সেই সেটি আবার নতুন করে গ্রহণ করেছেন আমাদের বিরোধী দলের নেতারা। এমনকিই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা, ছাত্র বলতে এক ধরনের তরুণ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা মিটিং-মিছিল করে, ছাত্রসংগঠন দলের ব্যানারে নির্বাচন করে এবং অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে আন্দোলন করে। তাদের পড়াশোনা করার একটি ব্যাপার থাকতে পারে, সেটি তারা আসলেই জানেন না। বিরোধী দলীয় নেত্রী স্বধন মধ্যবয়স্ক বিবাহিত, পুত্রসন্তানের জনক এক বিশ্বাস্ত সন্তানসহ তাদের ছাত্রসংগঠনের সভাপতি করে দিলেন এবং সাংবাদিকরা সেটি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনো বাতাক না রেখে একবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, ছাত্রসংগঠন করতে হলে তাকে ছাত্র হতে হয় কে বলছে? এই কথাটি যে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা হতে পারে সেই ব্যাপারটিই তিনি জানেন না। এই রাজনৈতিক নেতারাও দেশের হর্তকর্তা হয়ে যান! তখন তারা লেখাপড়ার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে নেন, সেটা আমরা কখনও কখনো অধি করি।

৩.

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের পড়াশোনার সবচেয়ে বড় যে সর্বনাশটি হয়েছে সেটি হচ্ছে নৃশংসনীরতাকে ধ্বংস করে দেওয়া। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এ দেশের রাজ্যকার আল-বদররা খুব হিংসার করে দেশের সকল বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করতে শুরু করেছিল, যেন আমরা জাতি হিসেবে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। সেবতন মনে হয় এখানেও ঠিক একই রকম ঘটন্য চলছে। আমরা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সৃজনশীলতা না শিখিয়ে মুখস্থ করতে শেখাচ্ছি যেন বড় হয়ে তারা কয়েকটা স্যাটিফিকেটের মালিক হই কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো কাজে না পারেন।

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি জিনিস। বিজ্ঞানীরা এখানে সেটি দিয়ে গবেষণা করছেন, তারা দেখেছেন এর বিকাশের কিছু বিচিত্র নিয়মানুসার রয়েছে। যেমন জন্মের পর যদি কোনো কাণ্ড দিয়ে একটা শিশুর চোখ বেঁধে দেওয়া হয় যেন সে দেবতের না পারে, এবং সেভাবে যদি বছরখানেক রেখে দেওয়া যায়, তাহলে সে জীবনে আর কখনোই দেবতের পারে না। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেবার কাজে সাহায্য করে সেই অংশটুকু যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করা হয় তাহলে মস্তিষ্ক সেটাকে অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলে, পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে সেখান কাজে ব্যবহার করতে চাইলেও সেটা ব্যবহার করা যায় না। মুক-বধির বাচ্চাদের হিয়ারি: এইড দেওয়ার বেলোতেও সেটা সত্যি। শিশু অবস্থায় দেওয়া না হলে সেটি কাজে লাগে না। নতুন ভাষা শেখার বেলোতেও দেখা গেছে ১০ বছর বয়সের আগে একটি শিশু আর্চর্ দক্ষতার সঙ্গে সেটি শিখতে পারে, কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে সেটি পরিপ্রমের ব্যাপার। ঠিক এ রকম সৃজনশীলতা শেখাও বয়স রয়েছে। স্কুল-কলেজে সৃজনশীলতা যদি শিখতে না পারে, বড় হয়ে সেই পিতৃ কখনোই ন্যাট্যিকারের সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না। অথচ আমরা অবলীলায় আমাদের পুরো গুণমানকে সৃজনশীলতা থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে এনেছি, পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটি এখন মুখস্থ করার মাঝে সমীকৃত হয়ে এসেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ কাজ করতে পারে কিন্তু যে কাজটি মোটেও ভালো করে করতে পারে না এবং ভালো করে করার কথাও নয়, সেটি হচ্ছে মুখস্থ করা। অথবা আমরা অনেক সময় পড়াশোনা করা এবং মুখস্থ করারকে সমার্থক বলে মনে করি। আমি খবরের কাগজে কুলের বিজ্ঞাপন দেখছি, সেখানে কুলটি কত ভালো সেটি বোঝানোর জন্য বড় বড় করে লেখা হয়েছে, 'এখানে মুখস্থ করানোর ভালো ব্যবস্থা রয়েছে।' 'এখানে চুরি শোখানোর ভালো ব্যবস্থা আছে' দেখা থাকলেও আমি এত আতঙ্কিত হতাম না! সবচেয়ে ভয়ানক কথা, যারা কুল পরীক্ষালা কলেন, তারা জানেন পর্যন্ত না যে ছাত্রজীবীদের মুখস্থ করার কথা নয়। তাদের শেখার কথা, জানার কথা।

পড়াশোনা মুখস্থনিষ্ঠার হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের কুলের ছেলেমেয়েদের জীবন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের মস্তিষ্ক যথেষ্ট মুখস্থ করার জন্য তৈরি হয়নি, তাই সেটি করতে অনেক বেশি সময় নেয় এবং কাজটি অত্যন্ত কষ্টকর। আমাদের দেশের একটি ছেলে কিংবা মেয়েও দৈনন্দিন জটিল দেখলে শিঙের উঠতে হয়, কারণ তারা

দিন-রাত পড়ছে। স্কুল থেকে আসার পর প্রাইভেট টিউটর, সেখান থেকে ব্যাচে পড়া, সেখান থেকে আবার অন্য একটি প্রাইভেট টিউটর এবং পুরো সময়টিতে শুধু মুখস্থ এবং মুখস্থ। এসএসসি পরীক্ষার পর কলেজে ঢোকার জন্য পড়া, এইচএসসি পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে ঢোকার জন্য পড়া—কোথাও এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নেই। এত বিশাল আয়োজন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে এইচএসসি নামক একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়, কিন্তু দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তার ফলাফলকে বিশ্বাস করতে সক্ষম নয়, তারা নিজেরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মেধা যাচাই করে নেয়। একটি দরিদ্র দেশের জন্য এটি কত বড় অপচয় কেউ ভেবে দেখেছে?

৪. স্বাধীনতার পর ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। একটি দেশের জন্য ৩০ বছর দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু একজন মানুষের জীবনের জন্য সেটি অনেক দীর্ঘ। আমাদের প্রিয়জনরা এই দেশের জন্য রক্ত দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছিল, দেশটি যদি মাথা তুলে না দাঁড়ায় তাহলে সেই রক্তের স্বপ্ন শোধ হবে না। আমরা আমাদের জীবনদশায় সেই রক্তের স্বপ্ন শোধ করে যেতে চাই। সেটি শোধ করতে হলে আমাদের কোনো শর্তকর্তি নেই। যেভাবেই হোক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই দেশের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করছে এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর।

দেশের একটি ভয়ঙ্কর তুর্দশি শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকেও সম্পূর্ণ নিজের চোঁটার মেধাধী ছেলেমেয়েরা বের হয়ে আসছে। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এই ছেলেমেয়েরা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি অসম বুদ্ধি জয় করে আসছে, কিন্তু এটি তো তাদের বিরুদ্ধে হুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল না, তাদের পক্ষে হুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল। ৩০ বছর আগে যেভাবে অস্বাভাবিক শত্রুর বিরুদ্ধে হুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, এখন ঠিক সেভাবে আবার একটা নতুন হুদ্ধ করার সময় হয়েছে। কেউ যদি পড়াশোনার ব্যাপারটি একটি মায়সারা দায়িত্ব হিসেবে মনে করে তাহলে চলবে না। এ দেশের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদের নিঃস্বার্থ পিকার পেছনে ঢেলে দিতে হবে, মুক্তকালীন অধ্যয়ন যেভাবে জীবন-মরণের প্রশ্ন চলে আসে আমাদের ঠিক সে রকম এখানেও জীবন-মরণের প্রশ্নটি দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো সত্ত্ব, এই কাজে সাহায্য করার জন্য দেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ প্রস্তুত।

এখন প্রয়োজন শুধু একটি সিদ্ধান্তের।

২৯ মার্চ, ২০০১

একি অপরূপ রূপে মা তোমায়

পহেলা বৈশাখ একটি পূর্ববর্ণন অনুষ্ঠানে আমার বুলনার একটি প্রত্যক্ষ প্রাণে যাওয়ার কথা। ভোর সাড়ে ৮টার সময় বাসে ওঠার ঠিক পূর্বমুহূর্তে খবর পেলাম, রমনার বটমুলে ছায়ানটের সন্নিকটবর্তী বোমা হামলার আটকন বার্যা গেছে। আমার মেয়েটিকে আমি আসার রাতে ভোজনের সময় খেতে এসেছি, সববর্ষের ভোরবেলা বাঁধা বাক্সা মেয়েরা সবাই মিলে শাড়ি পরে রমনার বটমুলে যাবে, কী শাড়ি পরা হবে, কীভাবে সাজা হবে সেটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাদের সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে আটকনকে হত্যা করা হয়েছে শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল।

শুধু আমার নয়, ঢাকা শহর এমনকি বাংলাদেশের সবার বুক কেঁপে উঠেছিল। নববর্ষের ভোরবেলা রমনার বটমুলের অনুষ্ঠানের মতো শিথি তোমল আনন্দময় কোনো অনুষ্ঠানের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। ঢাকা শহরের সব পরিবারের কেউ না কেউ সেখানে থাকে। উদীচীর অন্তর্গত বোমা হামলার সময় মেটামিটিভাবে সবাই জানত কারা হাশায়ে গেছে, কারা বিপন্নস্ত হতে পারে। সিপিবি'র জনসভাতেও বোমা দিয়ে মারার বেলাতেও একই কথা, সভাপতি রাজনৈতিক সভা, রাজনৈতিক কর্মীরাই সেখানে ছিলেন। কিন্তু রমনার বটমুলে বোমা হামলার ঘটনাটি অন্যরকম—এটি খবরের কাগজে দেখা বহু দূরের কোনো ঘটনা নয়, এটি ঢাকা শহরের এমনকি বাংলাদেশের সবার একেবারে কাছাকাছি ঘটনা। আমি এখানে একজন মানুষকেও পাইনি, যে সেদিন নিজের আপনজনের কথা ভেবে আতঙ্কিত হত।

মায়ায় বিরাতি দিয়ে আমি এবং আমার সহকর্মী আমাদের সন্তানদের আপনজনের থাক নিতে শিজে গেলাম। কিছুকালের মধ্যেই খবর পেলাম, তারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকলেও ভালো এলো। (বোমা হামলার কারা হারা গেছে তখনো জানি না। আমার বোনের মেয়েটি আকুল হয়ে কান্দছে। সে ছায়ানটের ছাত্রী, সেখানে সবাই তার আপনজন। আমার মেয়েটি হতকিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমু, যারা এভাবে বোমা মেরেছে তারা কী রকম মানুষ?'

আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। একটি অসম অনুষ্ঠানে হাসিখিঁচ অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুর মাঝে প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা মেরে একেবারে নিরাহ কিছু মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলে যারা সর্বত্র একধরনের পৈশাচিক আনন্দ পায়—তারা কী রকম মানুষ কিংবা আদৌ মানুষ কি না আমি জানি না। অনেকে তাদের হিংস্র পথ থেকে অগ্রহ বাকছেন কিন্তু আমি জানি পৃথিবীতে কোনো পথ অপরূপে নিজেরের এজাবে হত্যা করে না। তাদের পতন সপে তুলনা করলে পতনের অপমান করা হয়।

আমি আমাদের পরিবারের শিশুতোকে বুক জড়িয়ে ধরে আবার বাসে উঠেছি এবং তখন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি, আমি যেভাবে আমার সন্তানদের বুক জড়িয়ে ধরতে পারবো না। বাকি জীবন বুকের ভেতর এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা নিয়ে কাটিয়ে দেব। রেডিও-টেলিভিশন-বকরের কাগজে যে দুভারক বহুদূর একটি জিনিস বলে হতা হতো, হঠাৎ করে সেটিকে বুঝে কাছের জিনিস মনে হলো। সারা দিন বাসে বুলনা যাওয়ার সময়

আমি আমার নিজের ভেতরে এক বিচিত্র জেনাধ, কোভ ও ঘৃণা অনুভব করছি। ঢাকা থেকে খুলনা দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে একটি পরে পরে দেখেছি বর্ষবরণ অমুচান, বৈশাখী মেলা। রাস্তার পাশে পথে পথে গান গাইছে, কবিতা পড়ছে, ছোট ছোট শিশু মাঝের হাত ধরে, বাবার কাঁধে চড়ে আশকানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। এই হচ্ছে আমাদের, বাংলায় আরহমান কানের সংস্কৃতি। ফলস্বরূপ গভীর প্রেমটি এই সংস্কৃতিটুকু, এই ভালোবাসাটুকু যে এক শ্রেণীর মানুষ এক ভাষা পায় যে, এই হিংসা পাশবিকতা নিয়ে সেটাকে আঘাত করতে হবে, আমার জানা ছিল না।

কিন্তু এটি করছে সে সম্পর্কে আবছা তথ্য বের হয়ে আসছে— কিন্তু সেটি অনুমান করা এতটুকু কঠিন ছিল না। তারা বহুদিন থেকে প্রকাশ্য জনসভায় বাঙালির সংস্কৃতিতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। বাঙালির সর্বসম্মতনকে তারা প্রকাশ্যে হত্যা করার হুমকি দেয়, গোপনে তাদের হত্যা করা তাদের জন্য এমন কী কঠিন কাজ ?

যারা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের নবাব সামনে, তাদের পরিচয় উন্মোচন করে কি বিচার করা হবে ? আমার কেন জানি মনে হয়, শেষ পর্যন্ত বুঝি কিছু হবে না। যদি হতো তাহলে উদ্ভীর্ণি হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো, সিপিবি জনসভায় হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো। আমার জানি কিছু হয়নি— কেন হয়নি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে কিন্তু ফলাফল শূন্য। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার অনেক বড় বড় এবং ভালো কথা বলেছেন কিন্তু আমার আজকাল সেগুলো সে রকম বিশ্বাস হয় না। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা থেকে জানি, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারও মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তারা বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধার এক ভোট, সে রকম রাজ্যকাণ্ডেরও এক ভোট। তখনও একটি হত্যাকাণ্ডের মানবিক ঝটিক তারা দেখতে পান না, ভোটের রাজনীতিতে কত কৌশলে তারা সেটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য— আমার সব কটি রাজনৈতিক দলের ভেতরেই এটা দেখতে শুরু করছি।

কিন্তু শুধু আমি বিশ্বাস হারাছি না। রমজান বটমলে এই দুশ্চল ঘটনার পর বিশ্রুণি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। আমরা কি আশা করতে পারি না দেশের বৃহত্তম দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পাশাপাশি বসে এই ভয়ঙ্কর অপশক্তি, বিবেকহীন স্বর্গীয় স্বাধীনতাবিরোধীদের চিরদিনের জন্য দেশছাড়া করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে ? সেটা কি এতই অবগুণ্ডন একটি কর্মকাণ্ড? বর্তমানে সেটা না হচ্ছে, অথবা কী করতে পারি ? আমার মনে হয়, এই বীন অপশক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে শক্তি সেটা আমাদের হকের মাঝে সঞ্চার করতে পারি। সেটি হচ্ছে দেশের জন্য ভালোবাসা, দেশের সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসা, অসাম্প্রদায়িক সমাজের জন্য ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য ভালোবাসা। ১৯৭১ সালে তাদের পূর্বসূরীরা এ দেশে রক্তপাতা বইয়ে দিয়েও বুকের ভেতরকার ভালোবাসায় হাত দিতে পারেনি, এখন কেমন করে পারবে ? দেশ, দেশের মানুষ দেশের সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসার কী প্রচণ্ড শক্তি সেটি এই দানবরা কেমন করে জানবে ? এই গোপন, দেশমাতৃকার অপরাধ রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি, আমরা তো দেখছি। যখনই বটমলে যে পানটি মাখপুখ খেয়ে গিয়েছিল, সারা দেশে যে সেটি একসঙ্গে বেছে উঠতে শুরু করেছে সেটা কি তারা জানে?

৩০শ্রম আলো, ১৪ এপ্রিল, ২০০১

শূন্য দিয়ে গুণ

নতুন গুণ ভাগ করতে গিয়েছে এ রকম ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে আমি এ রকম একটা অংক করতে দিই : $982 \times 0.1 \times 82 \times 0.1 \times 0.2 \times 0.2 = ?$

এই বিশাল অংক দেখে বাচ্চাচ্চারা সাধারণত চোচামোচি তরু করে দেয়। যারা একটি শুদ্ধিমান তারা অবশ্য একটি পরেই আবিষ্কার করে ফেলে, বড় বড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করার পর গুণফল যাই হোক না কেন, শূন্য দিয়ে গুণ করার পর সেটা সব সময়ই শূন্য হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগের গত পাঁচ বছরের দেশ পরিচালনা দেখে আমার হঠাৎ করে এই ছেলেমানুষি অংকটার কথা মনে পড়ে গেল। শুধু মনে হচ্ছে তারা তাদের বিশাল বিশাল অর্জনে শূন্য দিয়ে গুণ করে শেষ মুহূর্তে পুরোটাকে শূন্য করে ফেলেতে উদ্ভূত হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক বড় বড় অর্জন রয়েছে। আমার নিজের হিসাবে তার মাঝে সবচেয়ে বড় এবং মহৎ অর্জন হচ্ছে পার্বত্য শান্তিচুক্তি। যদিও আমরা ত্রুটিপূর্ণ ভুলতে পারছি এই চুক্তির সত্যিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তবুও আমি আপ্যাবাদী। পার্বত্য এলাকার সংঘাতের কথা মনে হলেই আমার কেন জানি একাত্তরের কথা মনে পড়ে। একাত্তরে আমরা যেভাবে মারা গেছি ঠিক সেই একইভাবে পাহাড়ি মানুষ মারা যাচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে— এত বড় অবিচার নবাব চোখের আড়ালে ঘটে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সরকার পুরোপুরি অস্বাধীন সংঘাত শেষ করে একটা শান্তিচুক্তি করেছে, এর থেকে বড় ব্যাপার, মহৎ ব্যাপার আর কী হতে পারে ?

আওয়ামী লীগ সরকারের আরো একটা বড় সাফল্য ছিল মরণাভীতকালের সবচেয়ে বড় কল্যাণের পর সাধারণ মানুষের পুনর্বাসন। আমি নিজের কানে রিভিস থেকে বলতে চাইছি, এই ন্যায়ের পর বাংলাদেশে কোটি খানেক মানুষ মারা যেতে পারে। কিন্তু আমরা সবাই জানি বলার কারণে না খেয়ে কোনো মানুষ মারা যায়নি। এত বড় একটা সাফল্যের কথা কিন্তু যুব বড় পল্লার ফলাও করে কথনো বলা হয়নি। যে মানুষদের জীবন রক্ষা পেয়েছে তারা পরিব, দুই অপহায় মানুষ বলেই কি তাদের জীবন রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটিকে সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ?

কিছুদিন হলো বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, এটিও এই সরকারের একটি বিশাল অর্জন। এই দেশের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কিন্তু তার আগতন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাত্র টেকের সমান। আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে যতবার এই তথ্যটি উঠে এনেছে ততবার আমার বিশেষী বন্ধুরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছে। এত ছোট জায়গায় কেমন করে এতগুলো মানুষ থাকে সেটিই তাদের

কাছে একটি রহস্য, এই ছোট জাহাজেই যে এতগুলো মানুষের খাবার উৎপাদন করে ফেলা গেছে সেটি নিশ্চয়ই আরো বড় রহস্য। ঠিক হচ্ছে থাকলে আমাদের দেশে যে ম্যাজিক করে ফেলা যায় এটি তার একটি বড় উদাহরণ এবং এই ম্যাজিক করে ফেলার জন্য জাতি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ সরকার, কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বেগম মতিয়া চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

এছাড়াও সরকারের দল বড় অর্জন হচ্ছে কুখ্যাত ইনভেস্টিমেন্ট বিলটিকে সংবিধান থেকে দূর করে পুরো জাতিকে একটা অবমাননা থেকে রক্ষা করা। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডীদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে প্রতিিংসমূহকভাবে বিচার না করে তাদের যে এচলিট আইনে বিচার করা হয়েছে, সেটিও তাদের একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব।

গঙ্গার পানি চুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই ধরনের আরো বড় বড় কিছু সাফল্য রয়েছে, তবে আমার ব্যক্তিগত ফেবারিট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ফিরিয়ে আনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক উৎসাহ। দুই মুক্তিযোদ্ধাদের মাসে ৩০০ টাকা দেওয়াটি হয়তো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করবে না, কিন্তু যেন যে তাদের ভুলে যায়নি সেই অনুভূতির আবেদনটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যুদ্ধের পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের সমাহিত করার সিদ্ধান্তটিও একটি অপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আমি এই অত্যন্ত মানবিক সিদ্ধান্তটির জন্য এই সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

তথ্যপ্রযুক্তিকে বিকশিত করার জন্য সরকারের নানা প্রচেষ্টা চলছে এবং অল্প কিছুদিন হলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর নিয়ে একটি ট্যাকফোর্স গঠন করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির জন্য এখন যে বিনিয়োগ হচ্ছে তার ফল পেতে আর দু-এক বছর সময় নেবে, কিন্তু খান্দে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে মতো তথ্যপ্রযুক্তির ফসলও যে আমরা কিছুদিনের মধ্যে ঘরে তুলতে পারব সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আমি নিশ্চিত, একটি সময় নিয়ে ধাবনা-চিড়া করলে এই সরকারের সাফল্যের লিপি আরো লম্বা করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু এই মুহুর্তে যদি সাধারণ একজন মানুষকে আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ পরিচালনার কথা জিজ্ঞেস করা যায়, আমি বাড়ি ধরে বলতে পারি, সে তার সাফল্যের কোনো কথা বলবে না। সে বলবে এটি হচ্ছে সেই দল যে দল জাফানা হাজারীর মতো একজন জাতীয় স্বাস্থ্যী চরিত্রের সৃষ্টি করে, যে টিপু সুলতানের মতো একজন সাংবাদিককে নির্ধাতন করে পশু করে ফেলেও কেউ তার কোথাও স্পর্শ করতে পারে না। সে মাইন ভটারের কথা বলবে, সাংসদ ইকবালের মিছিল থেকে সন্ত্রাসীদের গুলি করার কথা বলবে, স্বনামধন্য 'রাজপুর' এবং তাদের কীর্তিকলাপের কথা বলবে, সারা দেশে সরকারি দলের সমর্থকদের অভ্যায়ার, অনুচর আর চাঁদাবাজির কথা বলবে। উম্মীচী, সিঁপিদির জনসভা আর রমনার বটুমুলে বোমা হামলার কথা বলবে, দু'শ'শ হত্যাকাণ্ডীদের না ধরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাড়ি ঘেঁষে চাপামোর কথা বলবে। এক কথাই, এই সরকারের বিশাল বিশাল সব অর্জন শেষ মুহুর্তে সন্ত্রাস নামক শূন্য দিয়ে গুণ করে পুরোটুক শূন্য করে ফেলবে।

২.

এটি আজকাল আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সন্ত্রাস ব্যাপারটি এখন একটি অশাস্ত্রিক ব্যাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয় সেটি নিয়ে কারো সেরকম মাথাব্যথা নেই। এর কারণটা কী?

আমার মনে হয় যারা ব্যাপারটি নিয়ে কিছু একটা করতে পারেন তারা ব্যাপারটি, ঠিক বিশ্বাস করবেন না। সব মন্ত্রী মহোদয় দামি দামি গাড়িতে যান, তাদের সামনে-পেছনে পুলিশ থাকে, তারা হুইসেল বাজিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে অন্যদের জন্য ট্রাফিক জামা সৃষ্টি করে চলে যান। কোনো সন্ত্রাসী তাদের জামার কলার চেপে ধরে সর্ব্বথ কেড়ে নিয়ে যায় না। তাদের হেলমেটেরা দেশে বিদেশের বড় বড় স্কুল-কলেজে পড়ে, মাঝ রাত্তে তারা ছুরিকাঘাত হয়ে হাসপাতালে যায় না। তাদের স্ত্রী বা কন্যাদের পার্শ্ববর্তীদের মেয়েদের মতো পতীর রাত্তে কাছ শেষে হেঁটে হেঁটে বস্বিতে ফিরতে হয় না, স্থানীয় মাক্তল তাদের ধর্ষণ করার জন্য ভুলে নিয়ে যায় না। সন্ত্রাসের পুরো ব্যাপারটিই তারা দেখেন খবরের কাগজে, দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এখন সেটা কাউকে বিচলিত করে না (হয়তাদের সময় প্রথমবার যখন একটা রিকশাওয়ালাকে পুড়িয়ে মারা হলো সারা জাতি তখন বিস্ময় হয়ে উঠেছিল। আজকাল সেটা প্রায় রুটিন হয়ে গেছে। কেউ কিছু মনে করে না-অনেকটা দেরকম!)। সন্ত্রাসের সবজগোয়ার গুরুত্ব একটু বেড়ে যায় যখন সেখানে নিজের দলের লোকজন থাকে, তাদের ছাড়িয়ে আনতে হয়, পুলিশের সঙ্গে কিংবা বর্বরদের কাগজের লোকজনের সঙ্গে দেননবর্বরার কল্লতে হয়।

এছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগ সরকার খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলছে। যে দলের একজন সাংসদের বাসায় বোমা ফাটানিতে বোমা বিক্ষোভ হয় সেই দল যোমাবাজির বিরুদ্ধে জোর দিয়ে কথা কেনন করে বলবে? যে দলের সাংসদের আশপাশে সন্ত্রাসীরা ওয়েস্টার্ন সিনেমার কায়দায় ভুলি করতে থাকে সেই দল অস্ত্রবাজির বিরুদ্ধে দু'খ তুলবে সেটা মনে? যে দলের সাংসদ এবং মহাপুত্ররা বুন-জাম-চাঁদাবাজিতে সবার ওপরে, তারা অন্যদের বুন-জাম-চাঁদাবাজিতে বাধা দেবেন কোন দলজায়? কাগজেই এখন ব্যাপারটিতে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, যা হয় হোক এই ধরনের একটি ভাব সবার ভেতর।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন একেবারে বিঘ্নিত হয়ে গেছে। বড় লোকেরা গাড়ি করে যায় বলে নিরাপদ থাকে, সাধারণ মানুষ তাদের রিকশা-টম্পো কিংবা পায়ে হেঁটে যেতে ছাড়ে তাদের সঙ্গে কথা বললে শিউরে উঠতে হয়। আমার পরিচিত এমন কেউ নেই যে সন্ত্রাস নিয়ে নিজের কোনো অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করনি। মনে হয় এটি বুকি সুস্থ কোনো দেশ নয়, এটা যেন ভয়ের কোনো সিনেমা থেকে উঠে আসা একটি দৃশ্য। যারা এটি খামতে পারতেন তারা সেই সিনেমার দর্শক, আমরা বাকি সবাই সেই দৃশ্যের জীবন্ত অভিনেতা। নিজের ইচ্ছা বিরুদ্ধে পরাবাস্তব সেই সিনেমায় অভিনয় করে যাচ্ছে।

ত.

যদি আমরা ধরে নিই বর্তমান সরকার সন্ত্রাস থামানোর ব্যাপারটি নিয়ে মোটেও উৎসাহী নয় তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—যে দেশে একটা সরকার থাকে সেখানে আইন প্রয়োগকারী একটা প্রতিষ্ঠান থাকে, তারা কী করছে? আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আগে হয়তো বিতর্ক করা যেত, আজকাল আর সেটা করার প্রয়োজন নেই। কিছুদিন হলো সেটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। একটা সমীক্ষা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রায়াণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। দেশের সব বরবরের কাগজে সেটা ছাপা হয়েছে, কেউ সেটার সভ্যতা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেনি। পুলিশ বাহিনীও তার প্রতিবাদ করেছে বলে শুনি। আমার ধারণা তারা বরং হাঁপ ছেড়ে বেচেছে। আগে তবু লোক দেখানো একটা কাজকর্ম করত হতো, এখন তারও প্রয়োজন নেই। পুলিশ বাহিনীকে সবচেয়ে দুর্নীতিপ্রায়াণ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার পর সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। এখন দুর্নীতি করা তাদের নৈতিক অধিকারের মতো চলে এসেছে। সে জন্যই মনে হয় সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধগুলো—খুন করে পানির ট্যাংকে মতবেহ ভুলিয়ে রাখা বা কিশোরী মেয়েদের ধর্ষণ করে খুন করে ফেলা—এই ঘটনাগুলো করছে পুলিশরাই।

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন, একাত্তর সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে মেরে ফেলেছিল বলে আজ বঁচে নেই। বঁচে থাকলে আজ নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেতেন। পুলিশ বাহিনীতে যারা সং মানুষ রয়েছেেন তারাও নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পান কিন্তু তাদের নিশ্চয়ই হাত-পা বাঁধা, তাই দেশের পরিসংখ্যানে তাদের বুজু পায় যায় না। আমি বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য আগে যেসব বই লিখেছি সেখানে পুলিশ অফিসারের চরিত্রগুলো ছিল সং, ইদানীং যেগুলো লিখছি নিজের অভ্যন্তরেই সেগুলো হয়ে যাচ্ছে অসং। আমার আশপাশে যাদের দেখি তাদের দেশে নীতিবান পুলিশের গল্প শোনা দিলে দিলে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই দেশে পুলিশ শুধু যে অসং হিসেবে পরিচিত হয়েছে তাই নয়—আদের কর্মক্ষমতা নিয়েও এখন সবার মনে প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পুলিশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সবচেয়ে কম। গত বছর মৌলবানীদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বাসায় ২৪ ঘণ্টার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। একদিন ভোরবেলায় আমাদের বাসায় বোমা মারা হলো। নিচে নেমে দেখি পুলিশের কোনো চিহ্ন নেই। হেঁচকো-চৈতন্যে চকু হলে দেখা গেল সচল পুলিশ প্যারিটের বোতাম ধাপাতে ধাপাতে আসছেন! মানুষেরা যখন কোনো কিছু বলার থাকে না তখন তারা কী বলে দেবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাদের তো এখানে পাহারায় থাকার কথা, আপনারা কোথায় ছিলেন?’ একজন বললেন, ‘আ-আ-আ-আ-’ বাক্যটি আর শেষ করলেন না।

সেই বোমায় কেউ আহত হয়নি বলে এতদিন পর আমি এর মাঝে কৌতুক বুঝে পাচ্ছি, কিন্তু দেশে শত শত ঘটনা ঘটেছে যার মাঝে কোনো কৌতুক নেই।

যেটি একেবারে একশতাংশ বিভীষিকা। যাদের আমাদের রক্ষা করার কথা, প্রাণভয়ে যখন তাদের থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াই তার থেকে দুঃস্থের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

কিছুদিন আগে স্বাভাবিক ২০০০-এ পেশানার বুদিসের নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়লে আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে একটি অন্যরকম ধারণা হয়। অপরাধ ব্যাপারটি তখন সম্পূর্ণ অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। পুলিশ বাহিনী আসলে একটি ইগজট্রিক মডেল। ইগজট্রি চালাতে কাঁচামাল লাগে, পুলিশের ইগজট্রিতে সেই কাঁচামাল হচ্ছে অপরাধ। অপরাধ দমন করে ফেললে ইগজট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সেটা দমন করা হয় না। সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, দুঃ-কলা দিয়ে পোষা হয় এবং অপরাধী, তার আত্মীয়জন, তার পক্ষে এবং বিপক্ষে যারা আছে তাদের সবাইকে যতদিন সম্ভব পোষণ করা হয়। এর মাঝে কোনো খুচরো ছাপ নেই। কোনো অপরাধ ঘটলে পুলিশ কেস নেবে কি সেবে না সেটা নির্ভর করে একদম একটা বিশ্বয়ের ওপর—অপরাধ দমন তার মাঝে একটা নয়। আমার এক ছাত্রকে কিছু সন্ধানী করে সবকিছু কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, সে কিছুতেই পুলিশের কাছে কেস করতেন না পেরে আমার কাছে এসেছে। আমি থানায় ফোন করে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কারণটা জিজ্ঞেস করতাই তিনি হঠাৎ করে কেস নিতে রাজি হয়ে গেলেন। আমি ছাত্রকে জানানোর পর দেখলাম সে ততক্ষণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। চুরি-ডাকাতি-খিনতাইকে আজকাল আর অপরাধ হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে এক সঙ্গে আটশজনকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত আজকাল আমরা সেটাকে অপরাধই মনে করি না।

৪.

সামনে নির্বাচন আসছে। নির্বাচনে জেতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কাজকর্ম শুরু করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের ভোটা নিয়েই তো নির্বাচনে জিততে হয়, সবাই তো আর দলীল কবী নয় যে একেবারে চোখ বুজে দলের পক্ষে ভোটা দেবে। সেই সাধারণ মানুষের দিকে কেউ তাকায় না কেন? বিরোধী দল হরতাল ডেকে সাধারণ মানুষকে নির্বাচন করে সেটাকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে ঘোষানোর চেষ্টা করছে। সরকার সন্ত্রাসকে শিল্প পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। রমনার ঘটনামূলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মানবিক কট্টরু তাদের চোখে পড়ে না, অপরাধী ধরায় তাদের বোনো উৎসাহ নেই, এই পৈশাচিক ঘটনাটি কীভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে সেটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সাধারণ মানুষ তো রাজনৈতিক নেতাদের মতো একতরু হরিণ নয়, তারা তো সবকিছুই বোঝে, তাহলে তাদের সঙ্গে এই হলনা কেন?

বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য বেনাথলি করি বলে আমি তাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পাই। কিছুদিন আগে একটি স্কুলের কিশোরী বয়েসের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। সে তার এলাকার উচ্চশ্রম কিছু সন্ধানীর জন্য স্কুলে যেতে পারেনা না, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সেহেটি জেনেছে সন্ধানী ছেলেগুলো ছাত্রলীগ

করে, কাজেই সে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি হেরে যায় তাহলে ছাত্রলীগ করা এই সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য কমবে, তখন সে আবার কুলে যেতে পারবে। মেয়েটি আমকে খিঁচছে, সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশা করছে আওয়ামী লীগ যেন ইলেকশনে হেরে যায়- তাহলে সে আবার কুলে যেতে পারবে।

মেয়েটির চিঠিটা পড়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলেছে, গণতন্ত্রের কথা বলেছে, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছে, স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিরোধ করে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করার কথা বলেছে, খাদ্যোৎপাদনশীলতা এবং তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলেছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলেছে কিন্তু ছোট্ট একটি মেয়ের কাছে তার কোনো মূল্য নেই, কোনো অর্থ নেই। বাংলাদেশে এক মমের মেয়ে কতজন আছে আমি জানি না। কিন্তু সন্ত্রাসের কাছে পরাজিত, আশাহত, বীতশ্রদ্ধ, স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাবিত, সুস্থ, ক্রোধান্বিত মানুষের সংখ্যা কম নয়- আমরা সেটা জানি।

সামনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় হয়ে আমার যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তথ্যপ্রযুক্তি, বাদ্য-বাসস্থান সবকিছু পেয়ে যাই কিন্তু সেই মেয়েটি যদি আর কুলে যেতে না পারে তাহলে সেই বিজয় দিয়ে আমরা কী করব? এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েই কি বাংলাদেশ নয়? তাদের একজনের স্বপ্ন ভঙ্গ করেও কি একটা দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যায়?

প্রথম অধ্যায়

১০ মে, ২০০১

সার্বমেরিন ফাইবার অপটিক কেবল এবং অন্যান্য মিথ

আমাদের দেশে যারা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে বোজাখবর রাখেন তাদের প্রায় সবাই জানেন, আশির দশকে আমাদের দেশকে সার্বমেরিন ফাইবার অপটিক কেবলের সঙ্গে সংযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে সময়কার সরকার সেই হাতের লক্ষ্যী পায়ে চলে গিয়েছিল বলে এখনো পৃথিবীর মূল নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমাদের ফাইবার অপটিক সংযোগ নেই এবং সারা পৃথিবীর মাঝে নিজেদেরকে মোটামুটিভাবে পচাঘুমুখী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিমুখ জাতি হিসেবে নিজেদের স্থান করে রেখেছি। যে সুযোগটি কোনো একটা কাগজে হাছুর করেই হয়তো পাওয়া যেত, এখন সেটা পাওয়ার জন্য ৫০০ থেকে হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এই সার্বমেরিন কেবলের জন্য চেষ্টা চলছে, সব কিছু ভালোয় ভালোয় শুরু হওয়ার পরও কেবলটি বসতে প্রায় দুবছর সময় লেগে যাওয়ার কথা।

এই ফাইবার অপটিক কেবল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বলে এখন এর গুরুত্বটি বুঝতে বাক্যে থাকি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এর ওপরে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে অনেকেরই ধারণা এই সার্বমেরিন কেবলটিই আমাদের একমাত্র এবং শেষ প্রতিবন্ধক এবং এটি সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাদের হাতে তথ্যপ্রযুক্তির অলাভান্বিত প্রদীপ চলে আসবে এবং আমাদের দেশে বন্য়ার পানির মতো ডলার আসতে শুরু করবে। আমার মনে হয়, সার্বমেরিন কেবলের মতো আমাদের মাঝে আরো কিছু মিথ রয়েছে যেগুলো খানিকটা পরিষ্কার করা দরকার।

১. ঢাকাবাসীর জন্য সুখবর

ফাইবার অপটিক কেবল হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরনের কাচের তন্তু (৮ মাইক্রন), যার ভেতর দিয়ে আলোকিত রশ্মি (Infrared) ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো হয়। গত দুই দশকে এই প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়েছে যে একটি কাচের তন্তুতে একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে অনায়াসে ১০ জিপা থাইট গুণা পাঠানো সম্ভব। খুব সাধারণভাবে (এবং একটু সরলীকরণ করে) বোকানোর জন্য বলা যেতে পারে এই দুহুতে কোনা যায় এ রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ১ লাখ VSAT-এর মাধ্যমে সে পরিমাণ তথ্য পাঠানো সম্ভব, একটি ফাইবার কেবল দিয়েই তার সমপরিমাণ তথ্য পাঠানো সম্ভব। তুলনা করার জন্য বলা যায় আমাদের দেশে এখন ৫০ থেকে ৬০টি VSAT রয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবিত ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ দেওয়া হবে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেবল টানা আছে বলে সেই সংযোগ ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাবে। ঢাকা থেকে সেটি নারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো প্রকৃতি নেই, কাজেই এই সার্বমেরিন কেবল সংযোগ দেওয়ার সারা দেশের

কোন লাভ হবে না, লাভ হবে শুধু ঢাকাবাসীর! (আমরা যারা মফস্বনে থাকি তারা সেই ব্যাপারটি অনেক দিন থেকে জানি। মাঝে মাঝে অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে ভেতরের জ্বালা খানিকটা প্রকাশ করি। এর বেশি কিছু নয়।) বাংলাদেশে সিঙ্গল মোড ফাইবারের আরো একটি নেটওয়ার্ক আছে (চারটি ফাইবারের ৫৬ কি.মি. এবং দুটি ফাইবারের দেড় হাজার কি.মি.)। তার মালিকানা তেলওয়া বিজ্ঞানের এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রামীফোনে তার ব্যাও-উইডথ ব্যবহার করছে।

সাবমেরিন কেবলের ব্যাও-উইডথ ব্যবহৃত করার জন্য সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক জালিয়ে কোনো ধরনের অবকাঠামো তৈরি করা না হলে সেটি সারা দেশের জন্য কোনো সুখার নয়। বাংলাদেশ সরকার খুব ছোট, এই দেশে এ রকম একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এখানে আরো একটি ব্যাপার সবাইকে খরচ করিয়ে দেওয়া যায়। ভারতে নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও অনেক VSA ব্যবহার করে অতের আদান-প্রদান করে থাকে। বড় ব্যাও উইডথের সুবিধাটুকু গ্রহণ করলে তার খরচও বাড়াবাড়ি কিছু নয়। কাজেই যতদিন ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ না হচ্ছে ততদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো মুক্তি নেই। বিশেষ করে আমরা যারা মফস্বলে থাকি সেটা সম্ভবত আমাদের এখানে দীর্ঘদিনের জন্য একমাত্র সমাধান।

২. শহরে এসেছে বাড়িতে আসিনি

ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ হওয়ার পর সেটি শহরে আসবে কিন্তু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসবে না। বাড়ি পর্যন্ত আসার জন্য এখনো একমাত্র উপায় টেলিফোন লাইনে এবং এই দেশে প্রতি ২০০ জন মানুষের মাঝে মাত্র একজন মানুষের টেলিফোন রয়েছে (০.৫%)। শুধু যে সংখ্যা কম ভাই নয়, টেলিফোন সংযোগ নেত্রদ্বারা ব্যায়ও সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি। কাজেই টেলিফোনকে সহজসাধ্য করে না তোলা পর্যন্ত এই সুযোগটি প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. নৌকা এবং পালকির দেশ বাংলাদেশ ?

গত বছর আমি একটা কাজে জার্মানি গিয়েছিলাম। যে শহরে ছিলাম ঘটনাক্রমে সেখানেই আন্তর্জাতিক Expo অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে বাংলাদেশের একটা চমৎকার প্যাভেলিয়ান ছিল। সেখানে ছিল একটা নৌকা, একটা রিকশা, একটা পালকি, বড়ো ছাওয়া একটা কুড়ুমার, বাঁশকাড় এবং সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা একটা নকশি কাঁথা (পাশেই পাকিস্তানের প্যাভেলিয়ানটি ছিল মূলত ফার্নিচারের সোফা, ঘনিষ্ঠ সেবাটি নিজস্বের মূল্যবোধ বেশ বলে দাবি করে কিন্তু দেখলাম তারা বেশ আয়োজন করেই মূল্যে বোকা রাখার ব্যাক বিক্রি করছে)। বাংলাদেশের অভ্যন্তর চমৎকার প্যাভেলিয়ানটি দেখে কিন্তু আমার মন ব্যাপার হয়েছিল। আমরা না চাইতেই সারা পৃথিবীতে আমাদেরক অনবসর, পিছিয়ে পড়া, বন্যা এবং ঘূর্ণঝড় পীড়িত একটি দেশ হিসেবে দেখানো হয়, যখন আমরা নিজেদেরকে অন্যদের

সামনে দেখানোর সুযোগ পাই তখন কি নিজেদেরকে একটি ভবিষ্যৎমুখী দেশ হিসেবে দেখাতে পারি না? পালকি এই দেশ থেকে উঠে গেছে। নৌকাতে পালানো ইঞ্জিন লাগানো হয়। ঢাকার বড় রাস্তায় রিকশা চালাতে দেওয়া হয় না- ইয়েলো ক্যাব চালানো হয়। যার একটা সন্মার্স আছে কুড়ুমারের বদলে টিনের মর তুলছে- তাহলে কেন আমরা দেশীয় সংস্কৃতির নামে নিজস্বের একটা গ্রাম্য পরিচয় তুলে ধরছি? এই দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য আমাদের সেই গ্রামেই ঘিরে নেতে হবে- সেটি আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আনতে চাইছি তখন ছোট নিজস্বেরকে গ্রাম্য, পঞ্চাৎমুখী হিসেবে পরিচয় দিলে হবে না-একটু অতিরিক্ত করে হলেও আধুনিক একটা পরিচয় তুলে ধরতে হবে। ইজারালে তার প্যাভেলিয়ানটিতে নামের স্থানান করেছে ISR&L- দেখেই বোকা যায় তারা পৃথিবীর সামনে নিজস্বের অন্য একটা পরিচয় নিয়ে আসছে। আমরা তাহলে কেন পৃথিবীর সামনে নিজস্বের পরিচয়টি ভালো করার চেষ্টা করছি না। সিলিকন ভ্যালিতে বেশির ভাগ মানুষ নাকি ভারতীয় কিন্তু আমরা জমি বিলতে যে রকম ইঞ্জিনিয়ার রেইনুয়েটের বেশির ভাগ বাংলাদেশের ঠিক সে রকম সিলিকন ভ্যালিতে যাদের ভারতীয় বলা হয় তাদের অনেকেরই বাংলাদেশের। তাদের পরিচয়, পরিসংখ্যান দিয়ে অনেক আয়োজন করে এখন পৃথিবীর সামনে আমাদের নতুন পরিচয় নিয়ে বের হওয়ার সময় এসেছে।

৪. আইটি নয়- আইসিটি

আইটি (Information Technology) বা তথ্যপ্রযুক্তি কথাটি এখন বাংলাদেশের একটি ঘরের কথা হয়ে গেছে। এ দেশের নতুন প্রজন্ম এই কথাটি নিয়ে খুব উৎসাহী। বলা যেতে পারে যে এটি এই দেশের মানুষের একটি বড় সাফল্য যে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎসাহী করতে পেরেছি। আমাদের দেশে বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদেরকে জনশক্তিতে পাঠে দেওয়ার প্রথম ধাপটি আসলে বলা হয়ে গেছে।

কিন্তু এর মাকে একটি ছাপার ঘটে গেছে বহরশব্দকে থেকে আইটি কথাটি পরিবর্তিত হয়ে আইসিটি হয়ে গেছে। পুরো কথাটি এখন Information and Communications Technology অর্থাৎ কমিউনিকেশনস সিস্টেমস যাবতীয় ব্যাপারকেও এর মাঝে নিয়ে আনা হয়েছে (ফাস্তর থেকে কেবল টিভি, মোবাইল ফোন থেকে ফাইবার অপটিক সবকিছু) এবং তার সঙ্গে আমাদের চেয়ে আশুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে শুধু জনশক্তি তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তির এই বিপ্লবে প্রবেশ করা যাবে না- তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। আমাদের প্রতি মুহূর্তে খরচ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন দেশজাজা নেটওয়ার্ক টেলিফোন সংযোগ, ওয়ারলেস প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, ফাইবার অপটিক প্রযুক্তি এবং কমিউনিকেশনসের মানুষ। এর মাঝে আর কোনো শটকাট নেই।

৫. ভাষা নয়- টেকনোলজি

আমি যে বছর যুক্তরাষ্ট্রে ছেড়ে দেশে চলে এসেছি ঠিক সেই বছর আমার কর্মস্থল (বেল কমিউনিকেশ্যন্স ল্যাব) থেকে বেশ কয়েকজন আলাদা হয়ে টেলিয়াম নামে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর একটি কোম্পানি শুরু করেছিল। ওই কোম্পানিতে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সবাই আমার সহকর্মী দু-একজন খনিষ্ঠ বন্ধু। সেখানে কৃষ্ণা বাল্য নামে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কালিমে বলে আমার দীর্ঘ সময় জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব, ধর্ম-সংস্কৃতি, এসব বড় বড় জিনিস নিয়ে কথা বলতাম। নতুন কোম্পানি যদি সফল হতে পারে তাহলে তারা পারলিক হওয়ার পর ইঠাং করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায়। তাই আমি মাঝে মাঝে যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়েছি, তখন কৃষ্ণা বাল্যকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছি সে মিলিওনিয়ার হয়ে গেছে কিনা। প্রতিবারই সে আমার ঠাট্টার জবাবে মুচকি হেসে জানিয়েছে, এখনো হয়নি। এবারে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়নি কারণ সে কোম্পানির সিটও হয়ে সারা আমেরিকা চষে বেড়াচ্ছে। কোম্পানি পারলিক হয়েছে এবং অ্যান্ডেলর কাছে ববর পেয়েছি সে কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছে। বিজনেস ইন্ডিয়া ম্যাগাজিনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমেরিকার সফল আইটি ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষ্ণা বাল্যের নাম-পরিচয়সহ বিশাল প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

কৃষ্ণা বাল্য খুব প্রতিভাবান ছেলে, অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান তুষ্টোড়, এব ওপরে তার লেখা বই রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার সাফল্যটি এসেছে অন্য জায়গা থেকে- সেটি এসেছে তার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা, খুব সুন্দর করে কথা বলে মানুষকে মুগ্ধ করা, গুছিয়ে লেখা এবং গুছিয়ে প্রকাশ করা থেকে। এই ব্যাপারটির গুরুত্ব যে কত বড় সেটি আমাদের দেশে এখনো ধরতে পারিনি। আমরা প্রতিভাবান মানুষ তৈরি করে ছেড়ে দেই। তাকে সুন্দর করে কথা বলা শিখিয়ে দেই না।

আমরা যদি শুধুপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রযুক্তির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন নতুন একটি জিনিস শিখতে হবে। সেটি হচ্ছে কথা বলে এবং লিখে নিজেকে প্রকাশ করা এবং এটি হতে হবে ইংরেজিতে। এখানে ইংরেজি এখন আর ভাষা নয়, এটি এখন একটি প্রযুক্তি। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে এখন শুধু ইংরেজিতে কথা বলা এবং সেখা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। শুধু যে পাখাখড় দেশের জন্য এর প্রয়োজন তা নয়। অতি সম্প্রতি জাপান এ ক্ষেত্রে ভালো ইংরেজি জানা মানুষ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এতদিন জাপানি ভাষাভাষাকে খুব গুরুত্ব দিত, কিন্তু এখন ইংরেজিতেই সফট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আমাদের শুধু তথ্যপ্রযুক্তি জানলেই হবে না, ইংরেজি জানতে হবে। কেউ যেন মনে না করে আমি পুরো শিক্ষা পদ্ধতি পাশ্বে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলছি। আমি বিশ্বাস করি

মাতৃভাষায় শেখার কোনো বিকল্প নেই। তারপরও আমাদের দেশে ১০ বছর স্কুল, দুই বছর কলেজ এবং চার বছর কলেজ/ইউনিভার্সিটিতে যেটুকু ইংরেজি শেখার কথা সেটা যথেষ্ট- যদি সেটা ঠিকমতো করা হতো। সেটাই ঠিকমতো করতে হবে, তার কোনো গত্যন্তর নেই।

৬. প্রোগ্রামার বনাম প্রজেক্ট ম্যানেজার

কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে প্রোগ্রামিং করতে পারলে সে রকম মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম, ইদানীং বেশ কিছু তরুণ-তরুণী বের হয়ে এসেছে। অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি নিজেরাই নতুন করে প্রোগ্রামার তৈরি করে নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছে এবং শুভম হঠাৎ করে তারা একটা রুঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে। সফটওয়্যারের বড় প্রজেক্ট হাতে নিতে হলে প্রোগ্রামারের সঙ্গে সঙ্গে প্রোজেক্ট ম্যানেজার, সিস্টেমস এনালিস্ট, ডিজাইন আর্কিটেক্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ডকুমেন্টেশন স্পেশালিস্টের মতো নানা ধরনের মানুষ। সত্যি কথা বলতে কী, সফটওয়্যারের একটা বড় প্রজেক্টে সত্যিকার প্রোগ্রামিং বা কোড লেখার জন্য সময় হয় খুব বেশি হলে ২০%- বেশির ভাগই হচ্ছে তার প্রস্তুতি, তার ডিজাইন, তার পরীক্ষণ ইত্যাদি। কিছুদিন আগে একটা সতীকা নিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রোগ্রামার ছাড়া অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলতে গেলে নেই, যারা আছে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম। যেটা সমস্যা সেটি হচ্ছে ট্রেনিং সেটায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোর্স নিয়ে এ ধরনের মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়- এদেরকে গড়ে উঠতে হবে সত্যিকারের কাজের মাধ্যমে।

কাগজেই সফটওয়্যার শিল্পে বড় হাতে অগ্রসর হতে হলে আমাদের প্রচুর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭. বন্ধুর ছেলে প্রোগ্রাম লিখে দেবে

সফটওয়্যার নিয়ে কথা বললে অনেককেই বলতে শুনেছি, তার বন্ধুর এক মেধারী ছেলে আছে, সে দিনরাত কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে, সে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য সফটওয়্যার লিখে দেবে। সাধারণত কমবয়সী স্ট্রেলেনমেরো মাঝে মাঝেই সেধার এক ধরনের বিশ্বাস দেখায়। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে প্রফেশনাল কাজ করানো যায় না। সবাইকে বুঝতে হবে যে এটি একটি শিল্প, ঘরে বলে টুকটাক কাজ করে এই শিল্প গড়ে তোলা যায় না। কেউ যদি সত্যিকারের একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে চায় তাহলে সেটি সত্যিকারের সফটওয়্যার কোম্পানিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হবে এবং সে জন্য অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন সেটি খুব সহজের, দ্রুত এবং অত্যন্ত অল্প খরচে তৈরি করিয়ে নেবেন। রেজিমেন্ট পেয়ে গেলে সেটি হতে পারে কিন্তু নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে সেটা সময় এবং খরচ সাপেক্ষ হবে, সেটি তাদের মনে নিতে হবে। সফটওয়্যারের জন্য এই অর্থ ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে নেওয়া যায় বলে এই অর্থ ব্যয় আসলে এক ধরনের বিনিয়োগ।

৮. সবাই হবে প্রোগ্রামার ?

যে কারণেই হোক অনেকের মাঝে একটা প্রচলিত বিশ্বাসের জন্ম হয়ে গেছে যে, তথ্যপ্রযুক্তিতে অবদান রাখতে হলে তাকে প্রোগ্রামার হতে হবে। এই ধারণাটি সঠিক নয়। সবাইকে প্রোগ্রামার হতে হবে না এবং সবাই ট্রেইনিং করলেও তাগো প্রোগ্রামার হতে পারবে না। যে কারণে সবাই অঙ্কের এক্সপার্ট বা গণক বা নৃশাস্ত্রী হতে পারে না, সে কারণে সবাই প্রোগ্রামার হতে পারে না। কিন্তু যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে সবাই প্রোগ্রামার না হয়েও কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজ করতে পারে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক কাজ করা হয়। ইদনীং যে কম্পিউটার নাম খুব বেশি শোনা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপ্ট, মাল্টিমিডিয়া, গুয়েরপেজ ডিজাইন ইত্যাদি। প্রোগ্রামার না হয়েও এসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করে এ ধরনের আরো নতুন নতুন ক্ষেত্র বের করা সম্ভব।

৯. শিশু এবং কম্পিউটার

কিছুদিন আগে একটি সমীক্ষায় দেখেছি, বাংলাদেশের প্রতি ৩০০ মানুষের জন্য একটি কম্পিউটার রয়েছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য সংখ্যাটি কিন্তু বিশাল। তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে অনেক আশার কথা শুনে অনেক মধ্যবিত্ত বাবা-মাও অনেক ধরনের ভাণ্ডারীকার করে ছেলেনেদের জন্য কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। তাদের অনেক ছেলেনেদের কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা ভালো যে কম্পিউটার একটি বিচিত্র যন্ত্র, এটি ব্যবহার করে একদিকে যে প্রথম সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব অন্যদিকে ঠিক সে প্রথম অর্থনৈতিক কম্পিউটার গেম খেলে সময়ের অপচয় করা সম্ভব। কম্পিউটারে খেলার জন্য যেসব গেম আবিষ্কার হয়েছে তার বেশির ভাগ নিয়ে বেলো আর টেনিসিশনে কাটান দেবে সময় নষ্ট করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

ভবে আশার কথা হচ্ছে, ছোট বাচ্চাদের মস্তিষ্ক কম্পিউটারকে সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারে খুব সহজে। আমি ১০-১২ বছরের বাচ্চাকেও ভিজুয়াল বেসিকে প্রোগ্রামিং করতে দেখেছি। কাজেই কালো বাসার কম্পিউটার খাটলে বাসার বাচ্চা-কাচ্চাকে প্রোগ্রামিং করতে উৎসাহ দেওয়া জরুরি। আজকাল বাংলাদেশেও অনেক বই বের হয়েছে। একবার একটি শিশু যদি প্রোগ্রামিং ব্যাপারটি কাঁধে ফেলতে পারে তার সৃজনশীল ক্ষমতাকে আর কেউ ঘামিয়ে রাখতে পারবে না।

১০. যদি ভোর ডাক শুনে কেউ না আসে

ডাক শুনে কেউ না এলে কবিগুরু একলা চলে উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির বেলায় কিন্তু সেটি সত্যি নয়। এখানে একলা চলে অল্প কিছুদূর যাওয়া যাবে কিন্তু পুরোটাছুটি যাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন অনাবাসি (Non Resident

Bangladeshi) বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাহায্য। যারা এ দেশে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তাদের পক্ষে সরাসরি পাকিস্তানি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন, কাজেই আমাদের সফটওয়্যার শিল্পকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে অনাবাসিদের সাহায্য খুব দরকার। আমরা আশা করে আছি দেশের প্রয়োজনে তারা নিজের থেকে এগিয়ে আসবেন। এ দেশে যারা আছেন তারা ব্যাপারটি সহজ করার জন্য খেঁচা প্রদত্ত থাকেন।

১১. অভ্যন্তরীণ বাজার

আমার ভাবনা-চিন্তায় যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি জরুরি মনে হয়েছে সেটি রেখেছি সবচেয়ে শেষে। সফটওয়্যার শিল্প দ্রুত গড়ে উঠতে পারে না, এর জন্য সময়ের দরকার। যারা দ্রুত অর্থোপার্জন করতে চেয়েছেন তারা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছিলেন এবং সেখানেও অনেকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বলে শিক্ষাবীররা খুব সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে। আমার ধারণা অনেক অর্থ ব্যয় করে দায়সারা কোর্স নেওয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে। একটি সফটওয়্যার শিল্পকে দাঁড়ানোর জন্য যে সময়টুকু দরকার সেটি খুব ধরত সাপেক্ষ। মাসের পর মাস প্রোগ্রামারদের বেতন ওনতে হয় কিন্তু করার মতো কাজ নেই। এই প্রোগ্রামারদের প্রয়োজনীয় কাজ খুঁজে দিতে হবে। দেশের ভেতরেই গ্রহণ করা রয়েছে, সেই কাজগুলো সফটওয়্যার শিল্পের সামনে ভুলে ধরতে হবে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বাংলা, ময়মনসিংহ, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলা যায়। সবাই যদি নিজেদের কম্পিউটারায়নের কাজ শুরু করে দেয় তাহলে দেখে একটি বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে, দেশের প্রোগ্রামাররা হাত পাকানোর জন্য কাজ খুঁজে পাবেন।

আমার মনে হয়, দেশের সফটওয়্যার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই অভ্যন্তরীণ বাজার। নিজ থেকে এটা যদি তৈরি হতে শুরু না করে তবে 'জাপ্টা স্টার্ট' দিয়ে এটাকে শুরু করিয়ে দিতে হবে। সফটওয়্যার শিল্পের জন্ম এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি।

৭ জুন ২০০১

রাজনীতিতে নীতি ফিরে পেতে চাই

১.

দুজন মানুষ কথা বলছে। প্রথমজন বলল, 'আমাদের দেশের রাজনীতিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয়জন জানতে চাইল, 'কেন?'

প্রথমজন মাথা নেড়ে বলল, 'রাজনীতির মাঝে পলিটিক্স ঢুকছে!'

এটি একটি কৌতুক, এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ ভালো একটি কৌতুক। তবে মজার ব্যাপার হলো কেউ যদি এটাকে কৌতুক হিসেবে না নিয়ে আক্ষরিক অর্থে নিতে চায় তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না। রাজনীতি শব্দটির মানে 'নীতি' নামের খুব মংং একটা শব্দ রয়েছে, কাজেই সেই রাজনীতির মাঝে কোনো মহত্ব যুক্ত না পেয়ে কেউ যদি সেটাকে 'দুর্ভিত পলিটিক্স' বলে তাকে চান আমরা তাকে বাধা দিতে পারব না।

আমি বাচ্চি ধরে বলতে পারি, আমাদের দেশে রাজনীতি বা পলিটিক্স শব্দটি একটি দূষিত শব্দে পরিণত হয়েছে। বাবা-মা যখন মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজেন তারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার খোঁজেন, ভুলেও একজন রাজনৈতিক নেতা খোঁজেন না। (আমি অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে রাজনৈতিক নেতা কোনো মেয়ের প্রতি কৌতুক দেখিয়েছেন জেলে বাবা-মায়ের আশ্রয়মা খাটা ছাড়া হয়ে গেছে।) সম্ভবতঃ মানুষ করতে গিয়ে যে বাবা দিন-রাতের খাটা-খাটুনি করে, যে মা জীবনপাত করে তার সন্তানেরা বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রফেসর হবে কল্পনা করে, কবি সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়ারকেও সেমে দেয়, কিন্তু ভুলেও কখনো চিন্তা করে না যে তারা বড় হয়ে রাজনৈতিক নেতা হবে। রাজনৈতিক নেতা তখন আমাদের চোখের সামনে দেশপ্রেমিক, আত্মী, দেশের জন্য নিরবলিভ গ্রাধ, আত্মবিক, সব একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে না, আজকাল স্বল্পশিক্ষিত, বিতপালী, সুবিধাবাদী, সঙ্গীরা ধরনের গড়মলার টাইপের একজন মানুষের চেহারা জেসে ওঠে। আমি ঢালাওভাবে বলব রাজনৈতিক নেতাদের অপমান করার জন্য এটি লিখছি না, শুধু সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে যেভাবে চলছে সেভাবে রাজনৈতিক নেতা কণাটি কিছুদিনের মাঝে একটি অপমানসূচক কথা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ছাত্র রাজনীতির জন্য সেটা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে— সাধারণ ছাত্রছাত্রী এটাকে পুরোপুরি পরিচ্যাপ করতেছে, চটোবাজি, চিলাসারী, মরগানি বা লেলুভুভুগি করা ছাড়া অন্য কারো ছাত্র রাজনীতিতে বিশ্বাস্য উৎসাহ নেই। রাজনীতির বেলাতেও সেটা যদি ঘটে যায় তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য একটি মস্ত দুর্ভাগ্য। কারণ এই দেশের সবচেয়ে বড় বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে। এই রাজনীতিতে যদি সাধারণ মানুষের সম্মানবোধ না থাকে, যদি বিবেকবান

মানুষেরা এই অসম্মতি নিজেদের অসম্ম নয় মনে করে মূলে সত্রে থাকেন তাহলে আর কখনো বসবস্তু, ভাড়াউদ্দিন, নেলসন ম্যাঙ্গেলা বা মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হবে না। আমরা শুধু পণ্য পণ্য জয়নাল হাজারী এবং নাসিরুদ্দিন খিটুর ভক্ত দিয়ে যাব।

রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আমরা যত ভুল-ভালিলাই করি না কেন, তাদের সম্পর্কে আমরা যত অপমানসূচক কথাই বলি না কেন, এই কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই রাজনৈতিক নেতাদের ওপরে। এই দেশের আদর্শ কি হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নাকি পশ্চাৎযুগী সম্প্রদায়িক— সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজনৈতিকভাবে। খানো স্বয়ংসম্পূর্ণ ইঞ্জার চেষ্টা করা হবে নাকি ভুখা দেশ হিসেবে বাইরে থেকে ভিক্ষা নেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্তটিও নেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে। সংবিধানকে অবিকৃত রাখা হবে নাকি সংশোধনের নাম দিয়ে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি করে দেশের লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য মুহুর্তে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, সেটাও ঠিক করা হয় রাজনৈতিকভাবে। শিক্ষার খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে নাকি সমারিক খাতে, সেটাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আবার শিক্ষার খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তার বড় অংশটুকু কি যাবে মাদ্রাসায় নাকি স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটাও ঠিক করা হয় রাজনৈতিকভাবে। এক কথায় একটি দেশ কি এগিয়ে যাবে, থমকে দাঁড়াবে নাকি মুখ খুঁড়বে পড়ে যাবে তার পুরোটুকু নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে যে মানুষগুলো সেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে, শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, তাহলে কেমন করে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে? আমরা যদি এই দেশকে দুই একটা দেশ হিসেবে ভেঁরি করতে চাই তাহলে সবার আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেই কাজটা কে করবে? আমরা, নাকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ?

২.

আমরা সেই কাজটা করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের রাজনৈতিক জ্ঞান খুব অল্প। কোনো রকম রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়াই কেন দেশের রাজনীতির ওপর আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা হেঁদে বসছি? উত্তরটি সহজ— এই দেশে আমাদের মতো মানুষের সংখ্যাই বেশি এবং আমরা রাজনীতি নিয়ে কী ভাবি সেটা অন্যদের জানা উচিত। যেই দেশে নির্বাচন করে সরকার পরিবর্তন করার পরীক্ষিত একটা পদ্ধতি আছে সেই দেশে আলোচনা করে কেন সরকার হঠাৎ হাবে সেটা আমাদের মাথায় ঢেকে না। হরতালকে কেউ মোচাবে দেখতে পারে না এবং যারা হরতাল ডেকে দেশকে অল রাইসে, রিকশাওয়ালাদের পুড়িয়ে মারে, দিন মজুরদেরকে অভূত রাখে, মানুষ তাদের অভিশাপ দেয়, তবু কেন তারা হরতাল ডাকে সেটাও আমরা বুঝি না। দলের সক্রাসী সেই দলের গুণু ক্ষতিই করে যায় তবু কেন তাদের ক্ষেত্র করে দলের সুবাদ বুঝি করা হয় না সেটাও আমরা বুঝি না। রহমান বটমুনে, গির্জায় বা নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা ফেলে

একেবারে নিরীহ মানুষজনকে খুন করার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে একটি রাজনৈতিক দল বুঝে ফেলে সেটি অন্য রাজনৈতিক দল করেছে সেটাও আমরা বুঝি না। মিটিংয়ে-মিটিংয়ে বক্তৃতা দিয়ে বিংবা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে একটা ডাছা মিথ্যা কথা বললে সেটা যে একটা ১০ বছরের বাচ্চাও বুঝতে পারে সেটা কেন রাজনৈতিক নেতারা ধরতে পারেন না, সেটাও আমরা জানি না। নির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়েও সংসদে কথা না বলে কেন পরাগ্রাঘাটে ছোট্ট ছুটি করতে হয় সেটাও আমরা বুঝি না। প্রতিপক্ষকে ছোট করার জন্য একেবারে নির্মজ্জভাবে যুখ খিঁচি করে গালি-গলাজ করলে যে আমাদের কারো ওলতে ভালো লাগে না এই সহজ জিনিসটিও কেন তাদের মাথায় ঢোকে না, সেটাও আমরা বুঝতে পারি না। এই ভুলিকা ইচ্ছে করলে আরো দীর্ঘ করা যায় কিন্তু মনে হয় তার প্রয়োজন নেই। একটা রাজনৈতিক দলের অঙ্ক সমর্থক হ্যাঁতো সব মিলিয়ে ১ থেকে ২ লাখ হবে ভোটারদের বাকি ৭ কোটি মানুষ কিন্তু আমাদের মতো। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য ভালোবাসা থাকতে পারে কিন্তু অন্ধ সমর্থকদের মতো তারা কখনোই দিনকে রাত কিংবা রাতকে দিন বিশ্বাস করছে রাজি ন। আমার বিবেচনায় মনে হয়, রাজনৈতিক দলের সমস্ত শক্তি ফয়সালা করা উচিত আমাদের মতো মানুষদের মনোবৃত্তি করার জন্য কিন্তু উটোটা তারা কেন আমাদেরকে পীড়ন করে যাচ্ছে সেটিও বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। দেশের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত না করে শুধু অজ্ঞ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে জোট কিনে কি একটি জাতীয় নির্বাচন জেতা যায়? যে যাই বলুক আমি সেটা বিশ্বাস করি না।

কাজেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একটা শুদ্ধার আসনে বসানোর কাজটি করতে হবে তাদের নিজেদেরকেই। আমরা যদি তার জন্য চেষ্টাও করি কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমরা যদি বলি রাজনৈতিক নেতারা আসলে অত্যন্ত স্বাধীন ব্যক্তি, কিন্তু খনি দেখা যায়, তারা জনসভায় বসেই অসহাজ মতো প্রতিপক্ষের কোমর ভেঙে ফেলবেন তখন তাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর স্বাধীন রাখা খুব মুশকিল। আমরা তো আমাদের বাসায় আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোনকে এই রকম অজ্ঞ-অশালীন ভাষায় কথা বলতে শুনি না, তাহলে এই দেশের মানুষের নেতারা এই ভাষায় কথা বলবেন? দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটিকেও আমরা প্রতিপক্ষকে নাকে ঝড় দেওয়ার কথা বলতে তত্ব নেই। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক দলগুলো রান্নি মায়িক প্রগতিশীল মানুষের নাম উল্লেখ করে তাদের খুন করে ফেলার কথা বলে। প্রকাশ্য জনসভায় রাজনৈতিক নেতারা পদত্যাগ না করে দেহত্যাগের আহ্বান জানায়। জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠনের যুগ্ম পঁচাত্তরজন হত্যায় গর্ভে উঠুক আরেকবার এই স্লোগানটি উচ্চারিত হতে অবশিষ্ট। পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে অনুপ্রেরণা বুঝি একটি রাজনৈতিক দলই পেতে পারে—সাধারণ মানুষ সেটা কল্পনাও করতে পারে না।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের জনসভায় এই ধরনের অশালীন কথা বলে নিজেদের দলীয় কর্মীদের কাছে থেকে বিশাল বাহবা পেতে পারেন কিন্তু সেই তথ্য যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আসে তারা কিন্তু লজ্জায়-

খুশার ছিঃ ছিঃ করে ওঠেন—এই সভাটি সবাইকে জানতে হবে। দেশের সবচেয়ে উচ্চাসনে আমরা কিছুতেই অসহিষ্ণু, অশালীন ও অভব্য ব্যবহার দেখতে চাই না, এটি কিছুতেই খুব বড় একটা দাবি হতে পারে না। এই ধরনের আচরণে তারা লজ্জা না পেতে পারেন কিন্তু আমাদের লজ্জায় মাথা কটা যায়।

৩.

অনির্দিষ্ট, আমার এই লেখা পড়ো রাজনৈতিক নেতারা আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে অটহাসি হাসছেন—এই দেশের রাজনীতি যে সহজ ভদ্রতা ভাব্যতার ভরা পার হয়ে অনেক আগেই সন্ত্রাস এবং কালো টাকার ভরাে নেমে গেছে তারা সম্ভবত আমাদের সেটা মনে করিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু আমি তবুও দেশের কোটি কোটি মানুষের মতো সেটা মেনে নিতে রাজি হব না—আমি ভাঙা রেকর্ডের মতো সুস্থ রাজনীতির মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে থাকব। ঐতিহাসিক দিশে একটি বড় বিপর্যয় ঘটে গেলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেন। এ দেশ বোমা হামলার একগুলো ঘটনা ঘটে গেলে তার জন্য পদত্যাগ করে থাপুক প্রতিপক্ষকে পোষারোপ করা ছাড়া কার্যকর আর কিছু করা হয়েছে কি? একটি বোমা হামলায় যত মানুষ মারা যায়, যত মানুষ পুত্র হয় গ্রায় তার সমানসংখ্যক মানুষ প্রতিদিন বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়। এই সম্পূর্ণ অবশ্যক মুক্তা নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী কি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা করেছেন, একটি বাস উদ্ধার করেছেন? রেল দুর্ঘটনা গ্রায় রপ্টন ব্যাপার হয়ে গেছে, মৌলবাদীরা খিশ প্লেট তুলে একটা বড় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটানোর পর যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মন্ত্রি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। গ্রায়গটি কর্মমাত ছিল এবং সম্ভবত তার জুতো এবং প্যান্ট ময়লা হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে কোলে করে সেখানে নেওয়া হয়েছিল। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষকে চাটাকাররা কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি আনন্দে হাসছেন—এই ছবিটি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আমি আমার জীবনে এর চেয়ে অশালীন কোনো ছবি দেখেছি বলে মনে করতে পারি না।

দেখুন—তখন মনে হচ্ছে আমরা সবাই যেন মেনে নিয়েছি এই দেশের রাজনীতি হচ্ছে সন্ত্রাস, কালো টাকা, জোর-জবরদস্তি কিংবা দল বদল। রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কসাকাকি একটি ব্যাপার, তুণমূল পর্যায়ের নেতারা কাজ করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতেন। নিজেদের একটা আদর্শ ছিল, এখন সেটা হয়ে গেছে জোটের রাজনীতি। যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি ভোটে আনতে পারবেন তিনিই হচ্ছেন নেতা—রাজনৈতিক মতদল কোন্টা ব্যাপারই নয় যখন যার প্রয়োজন, যেভাবে খুশি দল বদল করে যাচ্ছেন, আমরা লড়াই সেটা বেশ সহ্যও করে যাবি। সাধারণ মানুষের নেতারা হিটলে পড়ছেন, তাদের জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসছেন আমরা, ব্যবসায়ী, উচ্চাচার এবং জেনারেলরা। যে দলে সুবিধে সেই দলে যোগ দিচ্ছেন, আদর্শের কোনো ব্যাপার নেই। জাতীয় পার্টি চলে যাচ্ছে বিএনপিতে, জামায়াতে ইসলামী চলে আসছে আওয়ামী লীগে। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কারো কোনো চতুলভাড়া নেই—সবাই ধরেই নিয়েছে এটাই হচ্ছে রাজনীতি।

কিন্তু এটি রাজনীতি হতে পারে না। রাজনৈতিক নেতারা যতই চিন্তা করে বলুক না কেন যে রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নেই, আমরা সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমরা চাই রাজনীতিতে শেষ কথা থাকতে হবে, যে দল যে আদর্শের কথা বলবে তাকে সেই আদর্শের জন্য জীবনপণ করতে হবে, নিজের সুবিধার জন্য তারা দল ত্যাগ করতে পারবেন না, আদর্শ ত্যাগ করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তাদের জন্য আমাদের ভেতরে ঘৃণা এবং খিঁকার ছাড়া আর কিছু নেই।

৪. স্বাধীনতার পর ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। পঁচাত্তরের পর এই '৯৬ সাল থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবার সর্বকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এর মাঝে দুই তৃতীয়াংশ সময়, এরা কুড়ি বছর, এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা এবং পৌরষকে অবহেলা করা হয়েছে। ইতিহাস বইয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী না বলে হানাদার বাহিনী বলা হতো, রাজাকার কথাটি মুখে আনা হতো না, মুক্তিযুদ্ধকে বোঝানো হতো ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, পাকিস্তানকে ভারতীয় পরিকল্পনায় একটা সাময়িক 'গোলমাল'। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একটিবারও বঙ্গবন্ধুর নামটিও উচ্চারিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আড়াল করে রাখা হলে ধীরে ধীরে তার আবেদন এবং তীব্রতা কমে আসবে বলে একটা প্রচলিত বিশ্বাস নিশ্চয়ই কাজ করছিল।

কিন্তু ইতিহাসের নিজের একটা গতি আছে, তাই একেবারে হিসেব করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবহেলা করার পরও তার আবেদন কমেই। একাত্তরের নয় মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানুষিক নৃশংসতার কথা গোপন রাখা হয়েছে বলে ক্রিকেট মাঠে 'ম্যারি মি অফিসি' বলার মতো একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে সত্যি কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে তাদের জীবনের সবচেয়ে আদরে লালিত রূপ হিসেবে ধারণ করে রেখেছে। এই দেশে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে কোনো শক্তি আর বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে খাওয়ার আগে তাদের এতদিনের গুরু গোলামি আখ্যক ইতিহাসের আত্মকৃত্তি নিক্ষেপ করে ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হলে যে-বিএনপি জাতিকে বিভক্ত করার কুযুক্তি প্রদর্শন করে, তারাই ক্ষমতায় গেলে 'মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়' তৈরি করার কথা ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা 'মুক্তিযোদ্ধা মহাসম্মেলন' করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সার্বা দেশের সকল মানুষের যুদ্ধ, আওয়ামী লীগ করে না এ রকম অনেক দেশশ্রেণিক মুক্তিযোদ্ধা আছেন, কাজেই বিএনপি চাইলে এ রকম একটি মহাসম্মেলন করতে পারে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সম্মেলনের জন্য আমরা নিজে অপেক্ষা করছি। যত বেশি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্পৃক্ত করা যাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা ভর্তি বেশি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা কী বলবেন সেটা শোনার জন্য আমি অর্ধশয্যে খুব নীরব হস্ত নিয়ে অপেক্ষা করছি। মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর পৈশাচিক নির্বাচনের প্রিয়জন হারামিন এ রকম মুক্তিযোদ্ধা তো একজনও নেই— তারা নির্বাচনী সহযোগীদের কথা কী বলবেন?

কাজেই এটা খুব আশার কথা যে, চেষ্টা করার পরও সচেতন মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং জাহানারা ইমামের মতো ব্যক্তিদের আন্তরিকতার কারণে দেশের সাধারণ মানুষের বুকের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বেঁচে আছে। সেই চেতনা এত গভীরে প্রোথিত যে, নির্বাচনে ভোট চাইবার আগে সবাইকে সেই চেতনার কথাটি মুখে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এই দেশের জন্য এটি একটি মন্তব্যই অর্জন।

৫. আমাদের এখন আরো একটি অর্জনের সময় এসেছে, সেটা হচ্ছে রাজনীতি ব্যাপারটিতে সমান কিরিয়ে আনা। এটা কীভাবে হবে আমার জানা নেই। রাতারাতি সব রাজনৈতিক নেতা সং, দেশশ্রেণিক ও বিবেকবান হয়ে যাবেন সেটা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আমরা জোর গলায় সেটা চাইতে পারি। দল বদল করা যৌসুযী নেতা নয়— সাধারণ মানুষের মাস্তখান থেকে উঠে আসা তৃণমূল পর্যায়ের ত্যাগী নেতাদের চাই, যাদের এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে। যারা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেবেন, তাদের মাঝে আমরা কোনো শটকট মনে নেব না। রাজনীতির মাঝে নীতিটুকু কিরিয়ে দিতে হবে।

৬৪ম আলো

২৮ জুন ২০০১

উল্লাস কিংবা ক্রোধ নয়-কষ্ট

১.

ষ্টেশনে ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পাঁচ-ছয় বছরের একটি শিশু আমার সামনে এসে দাঁড়ান। তার ন্যাভা মাথা, খালি গা এবং কোমর থেকে কোনোমতে একটা প্যান্ট খুলে আছে। এই বয়সেই মানুষের সমবেদনা পাওয়ার নিয়ম মানুষগুলো সে ভালোভাবে শিখে গেছে। মাথাটা একটু কাচ করে একটা হাত খুঁকের ওপর আঁড়াআড়িভাবে রেখে অন্য হাতটি আমার সামনে মেলে ধরে 'ভাত খাওয়ার জন্য একটা টাকা চাইল। শিশুটি গোলগাল এবং নাদুসনুদুস, পেটটা প্রায় ফুটবলের মতো গোল-ভাত খাওয়ার টান পড়ছে সেরকম কোনো চিহ্ন নেই। তবে ছোট একটা শিশুর কাতর একটা মুখের সামনে এরকম যুক্তিতর্ক এটা না-আমি মানিনিয়োগ হাত দিয়ে দেখলাম সেখানে খুচরো টাকা নেই। একটু বিধা করে বড় একটা নোটটি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'যাও এটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসো, সেখান থেকে দেব।'

আমার আশপাশে যারা ছিলেন, তারা হা হা করে উঠলেন কিন্তু কিছু বোঝার আগেই শিশুটি ছোঁ মেঝের আমার হাত থেকে নোটটি নিয়ে অদৃশ হয়ে গেল। পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠতার মাঝে আমি বুঝিমান হিসেবে পরিচিত নই, তাতে আমি কিছু মনে করি না। আজকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অশরীতিত মানুষেরাও আমার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

এরকম সময়ে যোগাযোগ দেওয়া হলো ট্রেনটি নির্ধারিত এক নম্বর লাইনে না এসে দু নম্বর লাইনে দাঁড়াবে, কাজেই আমরা সবাই আমাদের মালপত্র টানটানি করে দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান। টানটান ভাড়টি নিয়ে এলেন গিঙটির আর আমাদের খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকল না। অর্থদণ্ড হলেও আমার হয়েছে কিন্তু আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন কোনো একটি বিচিত্র কারণে আমার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন।

অনেক সময় কেটে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেন এলোছে। আমাদের সবাই ব্যস্ত হয়ে নিজেরদের কামরা খুঁজে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি এরকম সময়ে দেখতে পেলাম ন্যাভা মাথা এবং খালি গায়ের সেই নাদুসনুদুস শিশুটি তার মুষ্টিবদ্ধ হাতে অনেকগুলো খুচরো টাকা শক্ত করে ধরে রেখে আমার কাছে ছুটে এসেছে। তার মুখে একটা উল্লসের চিহ্ন-আমাকে শত শত মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়ে সেখানে রাজ্য জয় করার আদর্শ ফুটে উঠল। কিছুই হয়নি এবং এটাই হাতবিকি-সেরকম ভদ্র করে আমি তার হাত থেকে জীর্ণ নোটগুলো নিয়ে তার কাছে দেওয়া, অসীকার মাতিক তার টাকা বুঝিয়ে দিলাম। সে জানাল নোটটি ভাঙতে তার বিস্তর সময়টা হয়েছে এজন্যই দেরি হয়ে গেছে। আমি মুখে প্রয়োজনীয় গর্জন ধরে রেখে তার ন্যাভা মাথা হাত বুঝিয়ে দিলাম।

এটি অত্যন্ত তুচ্ছ এবং সাধারণ একটি ঘটনা এবং এরকম ঘটনা সব সময়ই ঘটবে। এখন পর্যন্ত একবারও হয়নি যেখানে আমি একটি মানুষকে বিশ্বাস করেছি এবং

সেই মানুষটি তার জবাবে আমাকে ঠকিয়ে গেছে। দুঃস্বপ্ন মতলববাজ মানুষ পরিকল্পনা করে আমাকে ঠকিয়ে যায়নি তা নয়, কিন্তু আমি তাদের বিশ্বাস করেছি তাদের কেউ আমার বিশ্বাসের অপব্যবাস করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং খানিকটা ঘরকুনো মানুষ বলে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে বেশার সুযোগ পাই না। আজকাল ট্রেনে অনেক যাতায়াত করি বলে ষ্টেশনের শিশু-কিশোর অনেক হকারকে আমি চিনি। কয়েকদিন আগে একম একজন হকারের কাছে থেকে একটি ব্যবয়ের কাগজ কিনে তাকে আমি ১০ টাকার একটি নোট দিয়েছি। সে যখন ভাড়টি ফেরত দিচ্ছে আমি তখন তাকে উদাস লগায় বললাম, 'ফেরত দিতে হবে না, ব্যক্তিটা রেবে মাও।'

ফেলটি জুলুজুলে গোঁষে আমার দিকে তাকিয়ে ফুঁক করে বলল, 'কখনো দেখেছেন আমি আপনার কাছ থেকে বেশি রেখেছি?'

সত্য কথা। বাম হাত কনুইয়ের পর থেকে কাটা এই শিশুটিকে অনেক চেষ্টা করেও আমি সঠিক মূল্য থেকে বেশি দিতে পারিনি। সে কারো অনুগ্রহ নয় না, তার মর্যাদাবোধ আমার মর্যাদাবোধ থেকে এক তিল কম নয়। বহুদিন আগে আমি হাতকাটা এক কিশোরকে নিয়ে একটা কাসমিক পত্র নিয়েছিলাম- এই জীবন্ত চরিত্রের কাছে আমার সেই কাসমিক চরিত্র মান হয়ে আছে।

কাজেই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বলে আমার মেলামেশার ৯০ ভাগই হচ্ছে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিয়ে, সেখানেও আমার কোনো অভিযোগ নেই। সেদিন স্কানে টার্ম টেবিলের খাতা ফেরত দিয়েছি, টেবিলের প্রপুতলো নিয়ে কথা বলতে বলতে স্কানের সম্মুখ হয়ে গেছে। আমি চমক-ভাঙার ওড়িয়ে নিজের রুমের ঘিরে আসছি- তখন একজন ছাত্রী পেন্সন থেকে কুণ্ঠিত গলার আমার ভাবল। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতাই সে বলল, 'আমি ব্যক্তি তার টার্ম টেবিলের খাতায় নম্বর দিতে ভুল করেছি।'

আমার কাজকর্মে নানা ধরনের ভুল-ত্রুটি থাকে, চেষ্টা ধরেও সব সময় ওধরে নিতে পারি না, একই অবস্থাত হয়ে খাতাটি হাতে নিয়ে বললাম, 'কোনটিতে মার্ক দিই মি?'

'সবগুলোতে দিয়েছেন।'

'তাহলে?'

'যোগে ভুল করেছেন স্যার। ১০ নম্বর বেশি দিয়ে দিয়েছেন।' আমি নম্বর যোগ করে দেখলাম সত্যিই তাই। মুখের মাংসপেশিকে বিনুমাত্র শিথিল না করে কোনোরকম ভাবাবেগ ছাড়াই ঘাচ করে তার বাড়তি নম্বর কেটে দিয়ে তার খাতা তাকে ফিরিয়ে দিলাম, মানুষের পততা দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আমার জীবনে আমি যে বারান মানুষ দেখিনি তা নয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার-অগবদর আর জামায়াহর অনেক নৃশংসতা দেখেছি। মৌলবাদীরাও আজকার ওপর কম অভিচার করেনি। কিন্তু দিন আগেরও মর্মান্তিক সমসিহে তারা আমার বিলম্বে হ্যাংবিল বিলি করেছে, কিন্তু তারা আমার কাজকাছি মানুষ নয়, তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, যোগাযোগ হয় সে যত সাধারণ বা তুচ্ছ মানুষই হোক, তাদের সবচেয়ে দীর্ঘতায় আমি তাদের কোনো অভিযোগ নেই। দেশের এই সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে একটি জীবন পার করে দেওয়ার কথা চিন্তা করে আমি আপনদে উল্লসিত হই।

তাহলে কেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো আমার চারপাশের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ? কেন বলা হলো আমরা সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ জাতি?

২.

কেন বরষেই সেটি আমরা জানি। আমাদের চারপাশের সাদাসিধে, সহজ-সরল খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষের বাইরে ক্ষমতাপালী, শক্তিশ্বর ও কৌশলী কিছু মানুষ আছে, তাদের বড় অংশ বিবেক এবং নীতিহীন। তাদের সেই দুর্নীতির দায়ভার নিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে। সম্ভবত বাংলাদেশে পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে পুলিশরা ভাড়াভদের পাশাপাশি থেকে দল বেঁধে ভাড়াটি করে (প্রথম আলোর খবর), বাকী যেকোনো ধর্ষণ করে খুন করে ফেলে, মানিক মাসোহারা নষ্ট হয়ে যাবে বলে অপরাধীদের লালন করে এবং এর সবকিছুর মাঝে পুলিশের প্রধান বলেন, এই দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এই দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে না গিয়ে স্বাক্ষরীদের কাছে যায়, তাদের জন্য একে-৪৭ রাইফেল কিনে আনেন। এনএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু ছাত্র বহিষ্কার করা হয় না, সমান হারে শিক্ষকদেরও বহিষ্কার করা হয়। মজা্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীরা দেশের বড় বড় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের ছেলেরা মানুষ খুন করেও আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। বিরোধী দল হতভাল ডেকে এক-দুজন রিকশাওয়ালা বা টেম্পোচালককে পুড়িয়ে না মারা পর্যন্ত হতভালটি সফল হয়েছে বলে মনে করেন না। তবু খবরের কাগজে ছাপা হওয়া দুর্নীতি, অবিসার আর নৃশংসতার তালিকা যদি তৈরি করি সেই তালিকা দেখে যেম্মায়, বিভ্রমায়, রাগে-দুঃখে, অপমানে, যন্ত্রণায় এবং হতাশায় যেকোনো মানুষ বঁধি করে দেবে।

কিন্তু সেই মানুষগুলোর জন্য আমাদের এই দুর্গা তাদের সংখ্যা কত? আমার হিসাবে অত্যন্ত কম, অত্যন্ত ক্ষমতাপালী, গোষ্ঠী, অসং, চরম দুর্নীতিপরায়ণ, হিংসা ও দিবেকহীন মানুষের সংখ্যা সম্ভবত ১০০ জনের এক ভাগও নয়। অত্যন্ত দৈর্যশালী হলে বলব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে গোষ্ঠী, সামাজিক চাপে অপরাধী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি হলে হয়তো দেশের শতকরা ৫ ভাগ মানুষ কিন্তু দেশের বাকি ৯৫ ভাগ মানুষ নিশ্চয়ই সং, তাহলে এই পুত্র একটা অংশের জন্য দেশের ঝাট মানুষ কেন এতবড় একটা অপমান মাথা পেতে নেবে?

অন্যদের কথা জানি না, আমি কখনোই সেটা মাথা পেতে নিতে রাজি নই। বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার খবর শুনে আমি যেটুকু ধাক্কা খেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বড় ধাক্কা খেয়েছি তার প্রতিক্রিয়াটি দেখে। বিএনপি এবং তাদের সহযোগী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল উল্টাসের, সেই উল্টা গোপন রাখা নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মিটিং-মিছিল, আলোচনা-বিবৃতি সব জরাজপ্ত তারা এই তথ্যটি টেনে ধরেছেন। বাংলাদেশের এই দুর্নীতটুকুর জন্য যে তৎকালীন সরকার দায়ী সেটা তারা দাবী করে এবং সোজাসে গভীর করেছেন, তারা কমতায় গেলে যে রাজস্বাভি পুরো দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে ফেলবেন সেই কথাটিও খুব জোরগল্লায় ঘোষণা দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াটি ছিল জোড়ের। তারা প্রচণ্ড জোড়ে সেই পরিসংখ্যানটুকু প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে কেস করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের আসল লোকজনকে না পেয়ে এই দেশে যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের ওপর মনের খাল মিটিয়েছেন।

৩.

বাংলাদেশ সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রচারিত হওয়ার খবরে যারা উদ্ভাসিত হয়েছিলেন তাদের উল্টাসের কারণ এই তথ্যটুকু ব্যবহার করে নির্বাচনের মৌসুমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। যারা জোড়ামিত হয়েছিলেন তাদের জোড়ের কারণও এক। নির্বাচনের সময় এই তথ্যটুকু তাদের না সমসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অল্প কিছু মানুষের উল্টাস এবং জোড়ের বাইরেও দেশের মানুষের মনে আরো একটি অনুভূতি কাজ করেছে, সেই অনুভূতিটি ছিল কটোর। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনে আমরা সেই অনুভূতির খোঁজ পাইনি। কারণ দেশের সাধারণ মানুষ যারা সেই অনুভূতিকে বুকে ধারণ করেন তাদের মনের কথা খবরের কাগজে লেখা হয় না। দেশের জন্য ভালোবাসা রয়েছে, খেটে খাওয়া সেই সাধারণ মানুষ যারা শরীরের ধাম দিয়ে তিল তিল করে দেশটাকে গড়ে তুলছে তাদের অনুভূতিটি ছিল কটোর।

যারা বুকে সেই কটু পুখে রেখেছেন আমার এই লেখাটি তাদের জন্য।

৪.

একটা দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে— আগেও এ ধরনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের নাম সবার ওপরে (নেতিবাচক অর্থে) আসেনি বলে আমরা সেটা নিয়ে বিতর্ক তুলিনি। আমার ধারণা এই তালিকাবোলা এনএসসি পরীক্ষায় যেবা তালিকা রাখা মতো। যে ছেলে বা মেয়েটি এই মেথডালিকার একেবারে ধখ হয় ছেতে তারা যে অস্ত্রস্ত্র যেখানী ছাত্র বা ছাত্রী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ছেলেরা নাম তালিকার ধখের আসেনি কিন্তু প্রথম বিশ-ত্রিশ বা পঞ্চাশের মধ্যে আছে সেও কিন্তু একেবারে প্রথম হয়ে যাওয়া ছাত্র থেকে কোনো অংশে কম নয়। (এনএসসির ফলাফল দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন করে এই বৈষম্যের অনেকটুকু এক ধাক্কা দূর করে দেওয়া গেছে।) সেরবাম দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম এর আগে একেবারে প্রথমে হয়েছে কখনোই আসেনি, কিন্তু ব্যবহারই প্রথম ছিল— যার অর্থ এই দেশে খুব বড় ধরনের দুর্নীতি অনেকদিন থেকেই আছে।

মেথডালিকার প্রথম ২০-৩০ বা ৫০ জন ছেলেমেয়েই কাছাকাছি মেথডাি জানার পরও আমরা যেমন একেবারে প্রথম হয়ে যাওয়া ছেলে বা মেয়েটিকে নিয়ে বেশি উল্টাস প্রকাশ করি, সে নী হতে চাই, কারে সেবা পছন্দ করে, তার কাছে আদর্শ মানুষ কে, কোন ক্রিকেট টিম তার ফেবরিট এসব জানতে চাই— এখানেও সেই একই ব্যাপার। দুর্নীতির তালিকার একেবারে শীর্ষে উঠে যাওয়ার পর আমাদের কৌতূহলটাও অনেক বেড়ে গেছে। ঠিক কোন কোন ছেলেরা কারা অবদান রেখে আমাদের মুখে লজ্জার

গ্রানি মাথিয়েছে এবং ঠিক কী পদ্ধতিতে সেই তালিকা তৈরি হয়েছে, সেটা জানার জন্য আমাদের সবার অগ্রহ।

পদ্ধতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুনীতিপূরণ দেশ হিসেবে যোগ্য দেওয়ার পদ্ধতিটিতে অত্যন্ত বড় ধরনের ত্রুটি আছে। ২৭ জুলাই প্রথম আন্দোলনে এ জেড এম আবদুল আলী খুব গুহিয়ে এর ওপরে একটি লেখা লিখেছেন যেটা। পড়ে আমার চোখ খুলে গেছে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের দুনীতির পরিমাপ করতে গিয়ে যে সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভেতরে এত বড় অসামঞ্জস্য রয়েছে যে, পরিসংখ্যানের প্রচলিত বিজ্ঞানের হিসাবে বাংলাদেশের দুনীতি সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মতব্য করা দুঃসাধ্য। বিষয়টি এত গুরুতর যে, দি ইকোনমিস্ট পত্রিকাটি দুনীতির তালিকায় বাংলাদেশের নামটি রাখেনি— সর্বশেষ নামটি হচ্ছে নাইজেরিয়া। এ ধরনের আরো উদাহরণ আছে, যেখানে বাংলাদেশের নামটি রাখা হয়নি। কেউ যেন মনে না করে এর অর্থ দুনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খোয়া তুলসি পাড়া। এর অর্থ বাংলাদেশ দুনীতির কোন পর্যায়ের দৌ এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

এ ধরনের একটি অভিযোগ সার্বক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া করেছিলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ সাধারণ মানুষ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না, কিন্তু দি ইকোনমিস্ট পত্রিকার বিবেচনাটি তো খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে নিতে হয়— বিশেষ করে আমরা যখন জানি বাংলাদেশ সম্পর্কে অসামান্য জনক কথাবার্তা বলা পশ্চিমা সাংবাদিকদের একটি প্রিয় বিষয়, তারা এত সহজে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তালিকায় ঢাক চানাতেন না।

এবার তাহলে বাকি থাকল আমার অত্যন্ত সোজা একটি প্রশ্ন। যে তথ্যে এত অসঙ্গতি সেই তথ্য ব্যবহার করে কোন একক একটি দায়িত্বহীন মতব্য করা হলো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আন্তর্জাতিক একটা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় মানুষজনকে আমরা কখনো খুঁজে পাব না। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ অধ্যায়ের কর্মকর্তাদের আমরা সহজেই পেতে পারি— সত্যিকথা বলতে কি, তাদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে। যফসালে না গেলে ঢাকা শহরে থাকলে তাদের সঙ্গে আমার এর মতো কর্মকর্তার দেখা হয়ে য়েত। তারা সারা দেশের কাছে সমানী ব্যক্তি— আমি জানি তারা তাদের দায়িত্ব পূরণে আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে করেছেন, কাজেই তাদের অপেক্ষিতও আমার জানার খুব অগ্রহ। দি ইকোনমিস্ট যে তথ্যটুকু গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তারা সেই তথ্য কেন গ্রহণ করে প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন? যদি এটি তাদের অজ্ঞাতে হয়ে থাকে তাহলে কি সেটি নিয়ে তারা প্রতিবাদ করেছেন? যদি প্রতিবাদ না করে থাকেন তাহলে কেন করছেন না? যদি করে থাকেন তাহলে তার উত্তরে কী বলা হয়েছে? প্রতিষ্ঠানটির নামই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল— এর কাছে আমরা যদি স্বচ্ছতা দাবি না করতে পারি তাহলে কার কাছে করতে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এর উত্তর হয়তো পেয়ে যাব কিন্তু দুনীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম দেবে এই দেশের লায় লাখ শিত-কিশোর, তরুণ-তরুণী মনে যে কষ্ট পেয়েছে তাদের মনের কষ্ট দু'কোরে

ভবিষ্যতেও যত্ন দেয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়ার দায়িত্বটি কি তারা নেবেন না। আমাদের খুব বড় ভুল হয়ে গেছে' কথাটি উদ্ধারণ করা কি খুব কঠিন?

৫.

দেশে স্থায়ী হওয়ার আগে আমি যতদিন দেশের বাইরে ছিলাম এবং যতদিন দেশের বাইরে ছিলাম একদিনও দেশ, দেশের মানুষ বা দেশের সরকারের সমালোচনা করে একটি লাইনও লিখিনি। আমার মনে হতো দেশের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার না হয়ে তার সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই।

কেনে যিরে এসে আমি মনে করি আমার সেই অধিকার হয়েছে। আজকাল কোনো বিষয় আমাকে খুঁক করে তুললে আমি আমার মনের দুঃখ, কষ্ট, জেদ, ক্ষোভ, সজ্ঞা, অপমান (এবং অনেক সময় আনন্দ ও উল্লাসের কথাও) লিখে ফেলি। লিখতে গিয়ে এই দেশের অত্যন্ত সমস্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের নিয়েও কঠিন এবং জড় বাক্য উদ্ধারণ করে ফেলি কিন্তু তাদেরকে নিজের মানুষ বা প্রতিষ্ঠান বলেই করি।

আবার বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে যখন ভিন্ন দেশের কুটিং এবং সশেষব্রণ ইমিগ্রেশন পার হয়ে সেই দেশে ঢুকি তখন এই সবুজ পাসপোর্টের দেশটির জন্য মন কেমন কেমন করতে থাকে। দেশের সব নীলতা, হীনতা, নীচতা ফেলে রেখে তখন দেশটির শুণ্ড উজ্জ্বল অংশটি-বুই সবাইকে দেখাই। বছর সেক্টক আগে জার্মানিতে গিয়ে এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষদের সাম্মান্যতার দিতে গিয়ে তাদের একটি আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তরে চটে গিয়ে এমনভাবে বাংলাদেশের অর্জনের কথা বলতে শুরু করলাম যে, প্রশংসার উত্তরকে একেবারে হটকরিয়ে গেছেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আগামী নীপের কোনো নেতাজ এত জোর দিয়ে তাদের অর্জনের কথা কাউকে বলেনি! আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমাদের দেশ সম্পর্কে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, এখন ধারণা ভাঙল।'

আমি মনে মনে বললাম, তোমার হয়তো আগেই ঠিক ধারণা ছিল, হয়তো এখনই ভুল ধারণা দিয়ে পেলাম! কিন্তু সেজন্য আমার কোনো লজ্জা নেই। আমি বিব্রান করি, পৃথিবীর সামনে এই দেশটিকে একটি স্বাধীনজনক অবস্থানে নেওয়ার সময় হয়েছে, দেশকে নিয়ে অহঙ্কার করার অনেক কারণ আছে, সেগুলো গৌরব গণ্য বলার প্রয়োজন রয়েছে— দেশের হার্বের, দেশের মানুষের হার্বের।

এই দেশ এখন নবম গুরুত্বপূর্ণ শুণ্ড তাদের যত্ন করিয়ে দিতে হবে, দেশের নাগরিক মানুষ এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে নং মানুষদের একজন। দেশটিকে স্থায়ী দুনীতির শীর্ষে নিয়ে যেতে চাইলে এই দেশে বেঁচে থাকার তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। হাতে গোনা অল্প কিছু মানুষের জন্য দেশের বাকি ১০ কোটি মানুষ কিছুতেই লজ্জা এবং অপমান নিজদের মুখে বসে পাল করতে রাজি হব না।

এখন আসে

৪ আগস্ট, ২০০১

আহমদ হুফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার

খবরের কাগজের পেশেনের পৃষ্ঠায় আহমদ হুফার ছবি দেখে আমি কৌতূহলী চোখে খবরটির দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম— হুফা ভাই মারা গেছেন। খবরটি নিজের চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হলো না। আমার মনে হতে লাগল খবরটি ভুল, নিশ্চয়ই কোথাও ফোলন করলে জানা যাবে অন্য কেউ মারা গিয়েছে। হুফা ভাই ভালো আছেন। হুফা ভাই এভাবে হঠাৎ করে মারা যেতে পারেন না। যতবার ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়েছি আমার মনে হয়েছে হুফা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই— বেশ অনেকদিন দেখা হয়নি। পরেরবার যাব বলে পত্রিকল্পনা স্থগিত করেছি কিন্তু এখন কী হবে? তাঁর সঙ্গে যে আর কোনো দিনই দেখা হবে না। হুফা ভাই সত্যি সত্যি মারা গিয়েছেন খবরটি আচ্ছন্ন করার পর হঠাৎ করে আমার পরিচিত পুঁথিবাঁটি অন্য রকম দেখাতে শুরু করে। সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়।

বহর কয়েক আগে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের ওপর তলায় গিয়েছিলাম, আমি ছেলেকে বলেছিলাম যে তাকে আমি একশ ভাগ ষাঁটি একজন সাহিত্যিক দেখাব। হুফা ভাইয়ের ঘরটিতে গিয়ে সেখি তিনি মাথার নিচে কয়েকটা বই দিয়ে একটা বেঞ্চ লগা হয়ে তাকে ঘুমিয়ে আছেন। তার ঘুম ভাঙতে ইচ্ছে করল না, আমি আমার ছেলেকে ঘিসফিস করে বললাম, 'এই যে মানুষটা দেখছো তার মূল্যের ডগা থেকে পাছের নখ পর্যন্ত হচ্ছে একজন সত্যিকার সাহিত্যিকের।' আমার ছেলে অবিশ্বাসের নৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক কি নোকানের মতো একটা ঘরে কিছু বইকে বাঁধি বানিয়ে সিগারেটের টুকরো, খালি চায়ের কাপ আর কাগজের খুপের মাঝে গুণে থাকে? আমি আমার ছেলেকে বললাম, 'পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছে, সফল সাহিত্যিক আছে, জনপ্রিয় সাহিত্যিক আছে কিন্তু একেবারে একশ ভাগ ষাঁটি সাহিত্যিক খুব কম। তোমার কত বড় সৌভাগ্য যে তুমি আজকে একজনকে দেখতে পেলে।' আমি হুফা ভাইকে ঘুম থেকে তুলিনি— এখন মনে হচ্ছে নেন তুললাম না।

২.

আমি যখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন একেবারেই রুচন করতো ইচ্ছে করত না। দুপুরবেলা থেকেই পার্বলিক লাইব্রেরি এসে গল্পবই পড়তে বসে যেতাম। পার্বলিক লাইব্রেরিতে পশ্চিম বাংলার লেখকদের পাণ্যপালি আমাদের দেশের একেবারে হাতেগোনা যে দু-একজন লেখক ছিলেন তাদের মাঝে একজনের নাম আহমদ হুফা। সেই যুগে বই ছাপানো এত সহজ ছিল না— ছাপার খোঁশা না হলে কেউ বই ছাপাতো না। আমি খুব আদর নিয়ে আহমদ হুফার বই পড়তে শেখ

করলাম। কারো বই পড়লেই আমাকে চোখের সামনে সেই লেখকের একটা ছবি ভেসে ওঠে। এবারেও তাই হলো, ধারণা হলো আহমদ হুফা মানুষটি লগা চওড়া এবং মাথায় বাকড়া চুল এবং গমগম কর্তর। লেখকদের আমি কখনো চোখে দেখিনি— দেখা সম্ভব সরকারি খারণাও ছিল না। তাই কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ করে এই দেশে মুক্ত দেশের মুক্ত সংস্কৃতির মকবকে একটা আশ্চর্য্য হুড়িয়ে পড়ল। তরুণ লেখক-কবি-শিল্পীদের আমরা দেখতে শুরু করলাম। আমার প্রথম হুফা আহমেদ 'নন্দিত নরকে' নামে একটি উপন্যাস লিখেছে, খবর পেলাম আহমদ হুফা সেক্টরে বই হিসেবে ছাপানোর চেষ্টা করছেন। মুহসীন হালে হুফা আহমেদের রুমে আমার একদিন আহমদ হুফার সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। তাকে দেখে অবশ্যি আমার আঙুল শুকু হয়ে গেল, আমার কল্পনার সঙ্গে কোনো মিল নেই। মানুষটি ছোটগাটো, এলামেলা চুল, চৌদ বছরের কিশোরের মতো চেহারা এবং কথা বলেন অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে। ভুরু দুটি বেশির ভাগ সময়ই বিষয়ের ভঙ্গিতে ওপরে তুলে রাখেন, কথা বলেন অনুনাসিক হয়ে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। একটা দুটি বাক্য বলে হঠাৎ করে মুখ স্টুলা করে গম্বীর হয়ে যান। সম্পূর্ণ বিনা কারণে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ছোট বাগানের মতো হাসতে শুরু করেন। মানুষটি কে জানা না থাকলে তাকে যানিকটা অপ্রকৃতিস্থ ভাবা এতটুকু অস্বাভাবিক নয়। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গ্র্যান্ডেট করে ফুট আছাদের টানটানি করে যানিকটা নাম কামিয়েছি, হুফা ভাই সেই বিষয়টা জানার জন্য আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার কাছে পুরোইকু ঘনে হাত নেড়ে পুরো পারালৌকিক জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সুদ! জীবন্ত মানুষের সমস্যা নিয়েই বাঁচি না— এখন আমার মৃত আছার সমস্যা!'

এক কথায় এ রকম গুরুতর বিষয়কে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে আমি চমকুত হলাম। লেখক আহমদ হুফাকে আগেই পছন্দ করেছি, মানুষ হুফা ভাইকে আমার আরো বেশি পছন্দ হলো।

তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। হুফার সময় আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, পুরো পরিবারের খুব দুঃসময়। শরীদ পরিবার হিসেবে সরকার থেকে আমাদের একটা বাসা দিয়েছিল। একদিন রক্তীবাহিনী এসে আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়ে একেবারে আকস্মিক অর্থে পাথে নামিয়ে দিলো। আমরা শুধুমাত্র জগৎসংসারের জটিলতার একেবারে অনভিজ্ঞ, সারা বাংলায়তো আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তখন হুফা ভাই তার শুকনো পাতলা দেহ কিন্তু বিশাল একটি হৃদয় এবং নিঃশব্দে সাহস নিয়ে আমাদের পাশে এগিয়ে এলেন। সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে আমাদের পাশে কেউ একজন আছে সেই ভরসাটুকু যে কত বড় সেটা শুধু আমারই জানি। বেঁচে থাকার দুঃসহ প্রচেষ্টার মাঝে থেকে ছফা ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠতা হলো, তিনি তখন প্রায় নিরামিতভাবে আমাদের খোঁজ নিতে আসতেন। আমাদের মা-ভাইবোন সবার সঙ্গে তার খাতির। আমার মায়ের সঙ্গে তার খাতির সবচেয়ে বেশি। কারও কীভাবে কীভাবে জানি তার

পারাপা হয়েছো যে আমার মা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। প্রথম প্রথা সহজ সহজ স্বপ্ন দেখে ভেদে অন্যদের। ধীরে ধীরে তার স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করল। একদিন বাবার এসে দেখে আমার মা বিপন্ন মুখে বসে আছেন এবং ছফা ছাট হাতে-পা নেড়ে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন, সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে হবে। স্বপ্নটি এককথ। গ্রামের বাসিন্দারা ছোট ছোট ঘর... তাদের গায়ের রঙ কাঁসা। সেই গ্রামে বড় বড় তেলুগুখা। গ্রামের মাঠে ঘুরে মনুষ্য হতে চেষ্টা করি। তারা তেঁতুল গিটি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে... ইতালি ইতালি! ছফা ভাইয়ের স্বপ্নের বর্ণনা শুনে আমার হেসে গভাড়াগি যেতাম এবং তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমার মা হিমসিম খেতে খেতে...

সংগঠনটি ভুল করে দেওয়ার কাজটি ন্যায্য হয়েছে কিনা এতদিন পরে আমার মনে নেই। কিন্তু ইফা আইয়ের তোপের মুখে তাদের কাঁচুনাহু মুখ দেখে সেদিন আমার খুব মায়্য হয়েছিল।

9.

দেবেন বলে জানান। আমি ছফা ভাইয়ের লেখার বড় ভক্ত, বইমেলা ঘুরে ঘুরে তাঁর সব বই কিনে রেখেছি কিন্তু তাঁর নিজের হাতে দেওয়া উপহারের জন্যে সগ্রহে বসে রইলাম। কয়দিনের মাঝেই তাঁর নিজের হাতে কিছু সের্হোর্ট বাক্য লেখা 'পুষ্পবৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ' বইটি এসে হাজির হলো। আমি বইটি হস্ত করে তুলে রাখলাম- আমার সঙ্গে ছফা ভাইয়ের যোগাযোগ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

এর পরেরবার আমি যখন ঢাকা গিয়েছি একবার সময় করে আজিজ সুপার মার্কেটে দোকলার্য ভ্রমণে বের করলাম। আমাকে দেখে তিনি একেবারে ছেলখানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। চুল কমে এসেছে, যেটুকু আছে তাতে পাক ধরেছে, চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে এবং আগের থেকে একটু মোটা হয়েছেন কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই একই রকম কথা বলার ভঙ্গি, কথা বলার মাঝে কৌতুক, বিদ্রূপ আর চাতুর্য। অনেক দিন পরে দেখা, কথা বলতে বলতে ইচ্ছা তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, 'এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

আমাকে কয়েকটা ঘর দূরে নিয়ে গেলেন, সাটার টেনে ঝায় বন্ধ করে রাখা আছে, নিচে অল্প একটু বোলা। সিঁড়ার ভিতরে উঁচু হয়ে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে উঠি নিলাম। ভেতরে প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ছিন্নমূল হতদরিদ্র শিশু মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কাগজে লেখালেখি করছে। আমি জিজ্ঞাস করলাম, 'এয়া করা?'

ছফা ভাইয়ের মুখ একশ গুণাট বাহ্যের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'আমার ছাত্র। পরীক্ষা দিচ্ছে।'

তাঁর কাছে খবর পেলাম তিনি ছোট ছোট গরিব বাচ্চাদের কুল খুলেছেন, তাদের পড়াশোনা করানছেন। কোন বাচ্চাটির কী বিচিত্র প্রতিভা বলতে বলতে উৎসাহে এবং আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। কোনোদিন বিষয়ে করেননি, নিজের সংসার নেই- এই শিশুগুলোই এখন তাঁর জীবনের বড় অংশ।

এরপর থেকে সময় হলেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, কখনো তাঁকে পেয়েছি কখনো পাইনি। যখনই পেয়েছি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি। মনে আছে একবার তিনি সদা লিখে শেষ করা পুরো একটা কবিতার বই পড়ে তনিয়ে ফেললেন।

হাম রাজনীতির ওপর বর্বরের কাপজে আমার লেখা পড়ে ছফা ভাই উজ্জ্বল হয়ে আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তিনি যখন দেবলেন আমি যেটামুটি একজন প্রফেশনাল কলাম লেখক হয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে কলাম লিখতে শুরু করেছি তখন তিনি আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। একদিন আমাকে আশ্রমতো বকাবকি করে বললেন, 'তুমি একজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের কাজ করবে। এনব ছাইপাশ লেখা বন্ধ করো।'

আমি ধানিকঞ্চ তার সঙ্গে তর্ক করে হাল ছেড়ে নিলাম। ছফা ভাইয়ের লগে তর্ক করে পার পেয়ে যাবে- সে রকম মানুষ বাংলাদেশে কতজন আছে?

ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমার শুধু ছফা ভাইয়ের এই কথাগুলো মনে হচ্ছে- এবং মনে হচ্ছে ছফা ভাই আসলেই ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর মাঝে এখন এক তুফল

ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। সেখানে আমরা যারা 'গভীর তত্ত্বাবধা' লিখি তারা আসলে পত্রিকার কাটিং বাড়ানোর সাহায্য করি, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজদের ইগোতে এক ধরনের সুদৃষ্টি লাগে, তার বেশি তো কিছু নয়। কাজটি আসলেই ঠিক হচ্ছে না।

ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমি খুব কষ্টে আছি, তাকে বলা হলো না যে আমি তার কথাই ভনব বলে ঠিক করেছি। বিজ্ঞানের মানুষ যেটুকু পারি বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করব।

৪.

লেখালেখিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথা লিখতে হলে আমি সব সময় তার পুরো নাম সম্মানসূচকভাবে ব্যবহার করি, কিন্তু এই প্রথমবার আমি সেটা করতে পারি না। অনেক চেষ্টার পরও প্রতিবার আহমদ ছফা লিখতে গিয়ে ছফা ভাই লিখে ফেলেছি এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি। আজকে আমি মানুষ ছফা ভাই নিয়ে লিখেছি, যদিও লেখার উদ্দেশ্য মননশীল লেখক চিত্তাবিদ কবি ঔপন্যাসিক দার্শনিক গীতিকার আহমদ ছফা। তিনি বেঁচে থাকতে সেটা নিয়ে কোনো মূল্যায়ন হয়নি, এখন হয়েছে হবে। আমি তাঁর প্রকাশিত সব লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি এবং আমি জানি আমাদের বড় লেখাগুরু তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান মানুষের জন্য হয়েছিল। আমি এই দেশের নতুন প্রজন্মকে তাঁর সাহিত্যকর্ম পড়ে দেখতে অনুরোধ করব।

এইটুকু হচ্ছে আমার লেখার ভূমিকা। এবার আল বক্তব্যে আসি।

৫.

বাংলা একাডেমী থেকে প্রতি বছর এই দেশের কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটি আহমদ ছফাকে কখনো দেওয়া হয়নি। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তাঁকে সেই পুরস্কার দেওয়া হলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করতেন- কিন্তু সেটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের দারিদ্র ছিল তাঁকে সেই সম্মান প্রদর্শন করা। বাংলা একাডেমীর পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতিটি কী আমার জানা নেই। কিন্তু আহমদ ছফার মতো উঁচু মাপের একজন লেখককে যদি বাংলা একাডেমী তার উপযুক্ত এবং প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে না পারে তাহলে আমার ভেতরে বাংলা একাডেমীর জন্যে বিশেষ সম্মানরোধ অবশিষ্ট থাকবে না।

বাংলা একাডেমীর প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আহমদ ছফার সাহিত্যকর্মকে যথায় মূল্যায়ন করে তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে হলেও আমাদেরকে একটা লজ্জা এবং অপমান থেকে মুক্তি দেওয়া যোক। তা না হলে ভবিষ্যতে যারা এই পুরস্কার পাবে তারা দশজনের সামনে কেমন করে মুখ দেখাবে?

১৮ আগস্ট ২০০১

প্রিয় আইরী আলম

আইরী আলম মারা শিয়েরে ব্যাপারটি আমার এখনো বিশ্বাস হয় না। তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের কিছু তার মাঝেই এত চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যে আমি কিছুতেই তার মৃত্যুটিকে গ্রহণ করতে পারছি না। আমার ছোট ভাই যখন টেলিফোনে খবরটি জানিয়েছে তখন হঠাৎ করে মনে হয়েছে যুকের ভেতরে একটা অংশ শূন্য হয়ে গেছে। বারবার মনে হচ্ছে কেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, না হলেই তো সে খবরের কাগজে ছাপা হওয়া আলো একটি নাম হয়ে থাকত; আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না।

ওরুতেই বলে রাখছি, আইরী আলমের সজনপীলভাকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি টেলিভিশনের নটক, সিরিয়াল বা ভিডিও মাধ্যমের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই। ঘটনাক্রমে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে এরকম দু-একজন শিল্পী ছাড়া অন্যকে চিনি না। যেখানে থাকি সেখানে টেলিভিশন নেই বলে টেলিভিশনের নটক, সিরিয়াল কিছু দেখা হয় না। আমার বেশ কিছু লেখালেখিকে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, পরিচালকদের অনেক অনুরোধ করার পরও তারা আমাকে সেই ভিডিও সেন্সিটিবল বলে গিলের লেখার ন্যাট্যরূপও দেখতে পারিনি। (আইরী আলম একমাত্র ব্যতিক্রম, তার তৈরি 'প্রের' হচ্ছে একমাত্র চিত্রি সিরিয়াল যেটি আমি দেখতে পেরেছি, কারণ সে কথা রেখে আমাকে প্রেরের ভিডিও দিয়েছে।) মাঝেমধ্যে কদাচিৎ যদি টেলিভিশনে কিছু একটা দেখি কখনো ভালো লাগে, কখনো ভালো লাগে না। যারা বোদ্ধা দর্শক তারা বুঝতে পারেন কেন ভালো লাগেনি- আমি বোদ্ধা নই বলে কারণগুলো ধরতে পারি না। কাজেই আইরীর সজনপীলভার মূল্যায়ন আমি করতে পারব না- তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাই শুধু বলতে পারব।

আমি আগেই বলেছি, 'প্রের' নামে আমার লেখা একটি আধিজৈতিক বইকে টিভি সিরিয়াল করার ব্যাপারে আইরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরিচয়ের একবারে প্রথম দিকেই যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে তার প্রজ্ঞেশনালিজম- একশে টিকির গৃহ থেকে একবারে আনুষ্ঠানিক ঢুকি করা থেকে শুরু করে নটকের ক্রিস্ট সেখিয়ে সেওয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন, চরিত্রদের পাশাপাশি, সেট সম্পর্কে আলোচনা, কোনো কিছুই সে আমাকে না জানিয়ে করেনি। আমি সব সময় তাকে বলেছি আমি এর কিছু জানি না, কিছু বুঝি না কিন্তু সে শুধুও বামেনি। আমি নিশ্চিত কেউ বিশ্বাস করবেন না যে প্রের সিরিয়ালের নকশা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাঝে আমি শুধু হুমায়ুন ফরীদীকে চিনতাম! 'প্রের' বইয়ের স্ল্যাট আর্টিস্টদের উপাসনা সংক্রান্ত ব্যাপারটি স্বীকারে করা যায় সেটি নিয়ে আইরীর খুব ভাবনা ছিল। সেগুলো নিয়ে বারবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে। স্ল্যাট আর্টিস্টদের জন্য সন্ত্রস্তগোলা কথাগুলো সে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে গেছে।

একজন মানুষ কোনো ব্যাপার নিয়ে যে এত সিরিয়ান হতে পারে, আমি আইরীকে না দেখলে জানতে পারতাম না।

আমি আইরীর কাছে খবর পেলাম সে প্রের সিরিয়ালের তত্ত্বি শুরু করেছে। কিছুদিন পরে খবর পেলাম তত্ত্বি শেষ করে ফেলেছে। আরো কিছুদিন পর খবর পেলাম এডিটিং হচ্ছে- এত দ্রুত কেমন করে এত জটিল কাজ শেষ করতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমাকে একদিন সে ফোন করে জানাল প্রেরের প্রেস গো হবে- আমি যেন আমি। আমি সিরিতে থাকি বলে আসতে পারিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিত সবাই আমাকে জানান তারা রক্তদ্বাংসে প্রের দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। আইরী আলম শুধু যে সিরিয়ালটি তৈরি করেছে তাই নয়- তার প্রচারের জন্য চমৎকারের একটি আয়োজন করেছে। টেলিভিশনে দেওয়ার আগেই সে আমাকে একটি ভিডিও দিয়ে গেছে, যদিও আমি সেটা দেখেছি পরে। এর মাঝেই দোকমুখে ববর পেলাম সিরিয়ালটি নাকি খুব চমৎকার হয়েছে। যারা দেখেছে তারা পরের পর্বগুলো দেখার জন্য আইরীর অগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আমিও নিজে একদিন দেখার সুযোগ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আইরী আলমের প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম- তার কারণটি এরকম: আমাদের দেশের অভিনয়ের একটি টাইল আছে, টেলিভিশনের নটকের চরিত্রগুলো মাথা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, অসুখা কোনো একটি বস্তুর দিকে ডাকিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিম, বাস্তবতাবর্জিত একটি চরিত্র কথা বলেন। আমাদের নৈদর্শন দীর্ঘমেয়াদে আমরা যেভাবে কথা বলি তার সঙ্গে নটকের কথা বলার কোনো মিল নেই। (যারা বাংলা সিনেমা দেখেছেন তারা আনোবোধন একটি দৃশ্য দেখলে আমার আপর্গীত কোথায় সেটা বুঝতে পারবেন!) আমি আইরীকে বলেছিলাম যদিও এই মিডিয়াটির উনিশ-বিশ কিছুই আমি বুঝি না কিন্তু চরিত্রগুলো যেন স্বাভাবিক গলায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে। আইরী আমার অনুরোধ রেখেছে, সে চেষ্টা করেছে প্রত্যেকটা চরিত্রকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলানো। সবাই এত সুন্দর করে অভিনয় করেছে যে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। আমার নিজের কলম দিয়ে লিখ মূল চরিত্রের ভাষাব্যবহার মেয়েটিকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আইরী সেই দৃশ্যটি যখন টেলিভিশনে ফুটিয়ে তুলল তখন চরিত্রগুলোর কণ্ঠটুকু দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। যারা বোদ্ধা দর্শক তারা হয়তো এর ষ্টুনিয়াটি আলোচনা করবেন, সার্বকতা-ব্যর্থতা যাচাই করবেন। আমি সাধারণ দর্শক, আনন্দ পাওয়া ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না- আমি আইরীর কাজ দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

এর মাঝে ছাড়াছাড়িতে আইরী আমার সঙ্গে অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। তাকে প্রেরের দ্বিতীয় খণ্ড লিখ দিতে হবে। মজার ব্যাপার হলো প্রের তৈরি করার আগেই সে আমার কাছে এই প্রস্তাব দিয়ে এসেছে, সে স্বীকারে স্বীকারে জানি একবারে এক ভাগ নিশ্চিত ছিল 'প্রের' দর্শকনির্ভর হবে। এরকম আত্মবিশ্বাস আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি কখনোই আমার কোনো চরিত্রকে দ্বিতীয় খণ্ডে টেনে আনি। কিন্তু আইরী সেটা বুঝতে রাজি নয়। এতদিনে তার সঙ্গে আমার একটা মমতার বান্দন তৈরি হয়েছে। সে

পীড়িতমতো জোর করতে শুরু করল। পৃথিবীর অন্য কেউ হলে আমি রাজ হতাম না কিন্তু এই অল্পবয়স্ক ছোটফটে উৎসাহী সৃজনশীল সুদর্শন যুবকটির জন্য আমার অজান্তেই বুকের মাথোঁ এক ধরনের যমতার জন্ম হয়েছে। আমি তাকে বললাম ফেব্রুয়ারির বইমেলায় পর তাকে স্কিন্ট গিঞ্চে দেব- ফেব্রুয়ারি আসার অনেক আগেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

জগৎ অনিত্য, কেউই বেঁচে থাকবে না। সবকিছু জানার পরও একটি মৃত্যু এসে আমাদের সবকিছুকে ওলট-পালট করে দেয়। আহীরের মৃত্যুটিও এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। প্রথম প্রথম মনে হতো- কেন তার সঙ্গে পরিচয় হলো- পরিচয় না হলেই তো আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না। এখন মনে হচ্ছে, আমার খুব বড় সৌভাগ্য তাই আহীর এত কম সময় নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও তার সঙ্গে আমার স্মৃণিকের জন্য দেখা হয়েছিল। এই ছোট সময়টিতেই সে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, গ্রন্থান্তর আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি। তবুও আমার ভিতরে খুব ছোট একটা মানুষ, যাত্রা কিছুদিন আগে আহীর আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, 'সময়, আপনি আমার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি।'

'তাহলে আমাকে একটা স্টদের নাটক লিখে দেন।' আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম, 'আমি বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য ছেলেমানুষী লেখা লিখি- স্টদের নাটক লিখব কেমন করে!'

আহীর জোর করল- বলল, 'আপনি পারবেন। সময় আছে- আপনি চিন্তা করতে থাকুন।'

আমি কখনোই অনুগ্রহে এ ধরনের টেকি দিদি না, কিন্তু কী হলো জানি না, তবু আহীরকে খুশি করার জন্য রাতজোপে একটা নাটক লিখে ফেললাম। তাকে যখন জানিয়েছি সে একেবারে হেলেনাসুন্দের মতো খুশি হয়ে উঠল। আমার বাসা থেকে ওজ্রবার স্কিন্ট গিঞ্চে, খালা গিয়েছে মল্লবার।

আহীরের মৃত্যুতে আমার কোনো সাধুনা নেই- শুধু এইটুকু বলে নিজেকে প্রণোদ নেই, আমার কাছে সে ছোট একটা আনন্দের করছিল, আমার ক্ষমতা নেই জেনেও তবু আহীর বলেছিল বলে আমি সেটা তার জন্য করেছিলাম। তার সৃজনশীল জীবনের অন্যথ্য আনন্দের মাথোঁ হয়তো একচিরাবর হলেও আমি তাকে একবিন্দু আনন্দ দিয়েছিলাম!

আহা! যদি কোনোভাবে জানতাম সে এত তাড়াতড়ি চলে যাবে তাহলে তার জীবনটিকে আরো আনন্দময় করার জন্য আমি কি আরো কিছু একটা করতে চাইতাম না?

এখন আলো

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১

জয় হোক গণতন্ত্রের- জয় হোক বাংলাদেশের

প্রথম যখন বুকেতে পেরেছিলাম আমাদের নির্বাচনটি হবে সশস্ত্রবলের শেষে কিংবা অস্ত্রবলের প্রথম তখন আমি বুকের মাথোঁ এক ধরনের শর্য অনুভব করেছিলাম- কারণ এই সময়টা আমাদের দেশের বন্ধ্যার সময়। বান্ধাজি মানুষের তখন কী কষ্ট- শিশুকে বুকে জড়িয়ে থা, সব সহায়-সম্মল মাথায় নিয়ে বাবা, মায়ের আলো কিংবা বাবার কোমর জড়িয়ে থাকা কিশোর সন্তান এক বুক পানি ঠেলে আশ্রয়ের খোঁজে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটেতে থাকে- তখন মানুষ ভোট দেবে কেমন করে? যতই ভোটের সময় এগিয়ে আসছিল আমি ততই খনোযোগ দিয়ে ববরের কাণজের দিকে চোখ রাখছিলাম- চাঁদপুরে চিয়ার ঘাট, বেল স্টেশন ঘরে যাওয়ার ববরে বুকের মাথোঁ হঠাৎ ধক করে উঠেছিল কিন্তু পরে দেখলাম এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সারা দেশে এখনো বন্ধ্যার কোনো খোঁজ নেই। আমি নিশ্চিত বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করে ফেলবেন কিন্তু আমার জামাত তামো লাগে যে, এই দুঃখী দেশটার জন্য যোদ্ধার এক ধরনের মায়ো আছে, তাই এই বছর নির্বাচনের সময় তিনি ঝনটিয়ে আটকে রাখছেন, যেন সারা দেশের মানুষ এটাকে একটা উৎসবের মতো গানন করতে পারে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে খুব জোর গলায় একটা ববর পৌছে দিতে পারো যে, তারা ধর্মেজাটাকে যতই কলুষিত করার চেষ্টা করুক না কেন, এই দেশে গণতন্ত্র পাকপাকিভাবে খুব শক্ত ভিতের মাঝে বসিয়ে দেওয়ার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের মায়িটুকু খুব আতরিকভাবে পালন করে যাবে।

নির্বাচনের তারিখটি যতই এগিয়ে আসছিল ববরের কাণজ দেখে ততই মন খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মনে হয় ববরের কাণজের লোকজন বৃষ্টি খুঁজে খুঁজে শুধু খারাপ খবরওপোই ছাড়বে, খুনোখুনি, হাদাখ, খারপিত, ঘরবাড়ি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, রোমারজি, কুখনিত গালাগাল- কী সেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে দলবলন করার হিড়িক, এক দলের নথিবাসন না পেয়ে কয়েক ঘুরাপ আদর্শ এবং তাগা ছেঁড়া ছেঁড়ার মতো ছুড়ে ফেলে অন্য দলে নথু গিথিয়ে ফেলা- নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না, রাজনীতির পুরো ভাবভিত্তির ওপরেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসে-যেতে চায়। নিজেকে বৃষ্টিয়েছি, এসব পুত্র একটা অংশ- দেশের বেশির ভাগ প্রাণী নিচুই- সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা, তাদের দেশকে এবং নিজের দলকে, দলের আদর্শকে জেনোবাসেন। রাজনৈতিক দল আর তাদের প্রার্থীরা যাই করুক দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু উৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আমার কাছে সেনারল্যান্ড যাওয়ার একটি আমন্ত্রণ এসেছিল- হিসাব করে দেখেছি সেটা নির্বাচনের মাঝে পড়ে যায়, দেশের এত বড় একটা ব্যাপারে থাকতে পারব না সেটা তো হতে পারে না, আমি তাই না করে দিয়েছি। আমাদের বসার কাজে সাথ্য্য করা মেট্রো এবং ড্রাইভারও ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে ভোট- উৎসবে যোগ দেওয়া জন্য, ছেলেমেয়েদের ফুলে আনা-নেওয়া করতে হিমশিম বেয়ে যাচ্ছি, বাসায় কাজের মানুষ নেই বলে নিজেরাই খালীবাসন দুচ্ছি কিন্তু একবারও অভিযোগ করিনি। আমি ভোটার হয়েছি ঢাকায় তাই ঢাকা চলে এসেছি, ট্রেনে আমার

মতো অনেকে-সবাই ভোট দিতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিকবাহী কাজ বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে ভোট দিতে। যেদিকেই তু্যকই সেদিকেই নির্বাচনী প্রচারণা, মানুষজনের মিছিল, হাত-পা নেড়ে হাজার মজার স্রোতান। আগে যখন একটা মিছিল যেত রাজ্যের গাড়িঘোড়া বন্ধ হয়ে ট্রাফিক জ্যাম বেগে যেত। নির্বাচনী মিছিল অন্যরকম, ভোট চাইতে এসে হো সাধারণ মানুষকে পীড়ন করা যায় না- তাই মিছিলের পাশ দিয়ে দিবা গাড়ি, রিকশা-আনবাহন যাওয়ার ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষগণের মুখে উৎসাহ-উদ্বীপনা দেখে আমার বড় ভালো লাগে। দেশের সাধারণ মানুষ যদি এই পরিস্থিতিতে অংশ না নেয় তাহলে কেনম করে হবে ?

আজকের দিনটি দেশের জন্য একটা খুব বড় ঘটনা। ১৯৭১ সালে যে দেশটি নৃশংস অভ্যাত্যরকে যুদ্ধ দিয়ে পরাজিত করে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান নামক সেই দেশটির এখন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অবস্থা- তালেবান নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এখন তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ধরে চান দিয়েছে, ভবিষ্যতে কী হবে কেউ বলতে পারে না। অথচ আমরা গণতন্ত্রের কাণ্ড উড়িয়ে দুটি নির্বচনিত সরকার শেষ করে তৃতীয়টির জন্য অগ্রসর হচ্ছি- কী চমকবাক্য একটা ব্যাপার! মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা যদি দেখতেন নিচুই আজ খুব খুশি হতেন।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিচুই বিষাদ এসে স্পর্শ করত, যে যাতক-দালালদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সোনার সন্তানদের হত্যা করেছে তাদের অনেকে এই নির্বাচনের প্রার্থী। বররের কাগজে তাদের ছবি ছাপা হয়, টেলিভিশনে তাদের হাত উঠিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়, বর্ণপত্রের পাশে বসে তারা কথা বলেন- এই কলঙ্কটি আমাদের। আমরা এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারিনি- আমরা বড় ভুলতে ইচ্ছে করে দেশের সাধারণ ভোটাররা খুব খুশাভরে তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন। একই ধরনের খুশা প্রত্যাখ্যান করবেন স্বরাষ্ট্রবিশেষ, স্বরাষ্ট্রপালিশের, দলতান্ত্রীদের এবং নীতিশীল অন্তঃমানুষদের। রাজনৈতিক নেতারা এক ধরনের দু-জনীনিত নিয়ে আসতে চান কিন্তু সাধারণ ভোটাররা নিজের হাতের ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কী চায় সেটি দেখিয়ে দিয়ে কি একটা চমক লাগিয়ে দিতে পারে না ?

২.

নির্বাচনের ফলাফল কী হবে সেটি নিয়ে পরপ্রতিকার আলোচনার শেষ বৈঠক। যখনই কারো সঙ্গে দেখা হই মুহুর্তের নির্বাচনের কথা এসে যায়, কোন এলাকায় করে অবস্থা ভালো, কোন অবস্থা খারাপ সেটা দিয়ে আলগাভাবে আলোচনা হতে থাকে। কার ভোট ব্যাংকে এখন কত ভোট আছে, ঘটনাপ্রবাহে সেই ভোট ব্যাংকে আরো কত জমা পড়ছে বা আরো কত খাতিয়ে হয়েছে তার 'নিউট' পরিসংখ্যান দেওয়া হতে থাকে। যে যার সমর্থক সে তার সমর্থক অবধারিতভাবে একটা আশাবাদ ব্যক্ত করে ফেলেন!

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ থাকে গ্রামে, তাদের এক-চতুর্থাংশের বাসাতেও ইলেকট্রনিক্সিটি নেই, থাকলে আছে তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশও রেডিও-টেলিভিশন দেখার সুযোগ পান কি না সন্দেহ। এই মাধ্যমগণের সরকার নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এখান থেকে দেশে কিংবা সরকার সম্পর্কে নিরপেক্ষ একটা ধারণা পাওয়া খুব

কঠিন। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো মেট্রোমিটিভাবে স্বাধীন। দেশের সত্যিকার অবস্থাটি কম-বেশি কিংবা অতিরিক্ত হয়ে চলে আসে। পরপ্রতিকার সত্যলেন্স থেকে অনুমান করা যায় সব মিলিয়ে ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষ হাতের কাগজ পড়েন- তাদের গ্রাম সবাই হচ্ছে নগরবাসী। এদের পুরুষ মানুষ হলেও খাটো-বাক্সের গিয়ে কিছু খোঁজবন্ধ নিয়ে আসেন- মহিলারা নিকিতজ্ঞাভাবে সব তথ্যপ্রবাহ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এবং হাজার ব্যাপার হচ্ছে দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীই কিন্তু আজ দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

কাজেই আমাদের মতো মানুষেরা নির্বাচন সম্পর্কে কী বলি, কী জানি তাতে কিছু আসে-যাচ্ছে না- ভোটারদের সবচেয়ে বড় অংশটি কী জানবে সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বড় পাঁচ বছর তাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল, দু-মুঠো খেতে পেরেছেন কি না, মাথার ওপর আশ্রয় ছিল কি না, সন্তানদের জায়া-কাপড় দিতে পেরেছেন কি না, কুলে পাঠাতে পেরেছেন কি না, টাউট-মাত্রাকর, সন্তানী জীবন দূর্বিশ্ব করে ফেলেছে কি না- এসব ব্যাপারই সবকিছু ঠিক করবে, আমাদের মতো নগরবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সেটি জানা নেই।

এর মাঝে ঘটাপাণর হয়তো একটা ভূমিকা আছে- জটুর টাকাও বিলানো হচ্ছে তদেই। যারো অন্য প্রার্থী বা অন্য দলের সমর্থক হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে এবং এর সহজ টাটগে হচ্ছে সংখ্যানয়ুর। খবরের কাগজে ব্যাপারটি এসেছে, তার প্রতিকারের প্রচিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আশা করছি সেই প্রচিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নির্বাচনী প্রচারণাতেও মিথ্যাচার এবং সাপ্তাহিকতার ব্যবহার চলছে। একজনের মুখে অন্যরান ভিনি নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে কনতে খেলেন অন্য দল এসে তার প্রার্থীকে হিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে চলে গেছেন। অনেক স্কো জেগেও ভিনি তাদের বোঝাতে পারলেন না যে, কথটি সত্য নয়। সত্যি হলেও সেটি সমস্যা ই-গরার কথা নয় কিন্তু কয়টি জোটের জন্য ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষজনকে সাপ্তাহিকতার কয়ে ফেনে শেষ পর্যন্ত খোঁচাটা তার হবে? নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে নানা ধরনের নোরাশির মতো হুঁশ করে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোয় মহিলা সৌখুরী নির্বাচনী প্রচারণার খবরটি বুকের মাঝে এক ধরনের স্মৃতি সন্ধান বইতে দিল। এলাকার মানুষ তার জন্য খাটাখাটনি করছে কিন্তু তার নিজের দলের মানুষ শাকি মুগ্ধ-সুবিধা পায়নি বলে ব্যনিকটা ক্ষুদ্র!

৩.

আজ তো নির্বাচন হয়ে যাবে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর কী হবে সেটি নিয়ে সারা দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের উৎকণ্ঠা। বড় দল, মাঝারি দল, ছোট দল সবাই বলছেন তারা জিতে যাবেন- কিন্তু সেটি তো সত্যি হতে পারে না, সবাই তো সরকার গঠন করবেন না, সরকার গঠন করতে পারবেন এক দল বা এক জোট। দেশের সব মানুষের প্রশ্ন, তখন কী হবে? কোনো দলই বলেননি তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন, সবাই বলেছেন নির্বাচন 'অবাহ', 'সুদু' এবং 'নিরপেক্ষ' হলে তারা ফলাফল মেনে নেবেন। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে 'অবাহ, সুদু এবং নিরপেক্ষ' কথাগুলোর অর্থ কী? সে ব্যাপারেও তারা একটা আভান দিয়ে

রেখেছেন, যেহেতু 'অবাধ, সৃষ্ট এবং নিরপেক্ষ' নির্বাচন হলে তারা জিতে যাবেন কাজেই নির্বাচনে জিতে গেলেই বুঝতে হবে সেটি অবাধ, সৃষ্ট এবং নিরপেক্ষ হয়েছে। সেটি অবশ্যই একটা সমাধান হতে পারে না। আমাদের দেশের পরপ্রক্রিকাগুলো মোটামুটি স্বাধীন, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে, দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকরা থাকবেন, নির্বাচন কমিশনও বলাছেন দরকার হলে তারা আটবার নির্বাচন করবেন তবুও সৃষ্টভাবে নির্বাচন করবেন, দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব নেই, কাজেই নির্বাচনটি সৃষ্টভাবে হয়ে থাকলে সেটি দেশের মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। তখন বড় রাজনৈতিক দলগুলোর খুব দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে, নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে হবে এবং সারা দেশে হরতাল, হাঙ্গামা, খুন্দাখুনি করে একটা অরাজক অবস্থা তৈরি করতে পারবেন না। কয়দিন আগে ট্রেনে আগার সময় আখাউড়া স্টেশনে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকা পড়ে ইলামা, নিজের দল থেকে নমিনেশন না পেয়ে কোনো একজন প্রার্থীর সমর্থকরা সব ট্রেনকে আটকে রেখেছেন, মানুষের কী কষ্ট! এরকম অযৌক্তিক এবং হাস্যকর একটা কারণে যে একেবারে নিরপরাধ, নিরীহ সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করা যায় সেটি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত না হলে রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছে করলে যে সারা দেশে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন সেটি নিয়ে আমাদের কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই, চিন্তা করেই আমাদের বুক কঁপে ওঠে।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনে আনন্দের অশ্রীদার হতে চায়, এর যন্ত্রণার নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমার করজোড়ে আবেদন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। গণতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিস্থা, বিশাল সংসদে একজন বা দুই সংসদ সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে থেকে মুক্তি-ভরক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল সরকার গঠন না করেও দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কি অংশ নিতে পারে না? শক্তিশালী একটি বিরোধী দল থাকলে একটি সরকার কি কখনো দেশের স্বার্থবিরোধী, আদর্শ এবং নীতির বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

৪. বাংলাদেশ হাট হাট পা পা করে সবুজে অগ্রসর হচ্ছে— আজকের নির্বাচনটি হবে সেই সবুজখাজার আরো একটি মহান কলক। নির্বাচনের ফলাফল চোখে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক ধরনের আত্মোপলব্ধি হবে— কামনা করি সেই আত্মোপলব্ধি হোক সঠিক। আমাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শক্তি হিসেবে কাজ করুক এই আত্মোপলব্ধি। রাজনীতিতে তরু করুক— বরেন্না বাক দমিত রক্ত। রাজনৈতিক দলগুলো হিসাব-নিকাশ করুক তাদের জায়-পায়াকয়ের কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হিসাব হোক খুব সহজ এবং সরল। এই নির্বাচনে জয় আমাদের, জয় গণতন্ত্রের আর তাই জয় বাংলাদেশের।

৪র্থ অংশ, ১ অক্টোবর ২০০৩

'সংখ্যালঘু' নয়— বাংলাদেশের নাগরিক

১.

আমি গত কয়েকদিন থেকে বরবরের কাগজ পড়তে পারছি না— যে কাগজই হাতে নিই সেখানেই পুরো পত্রিকা জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়ঙ্কর নির্বাসনের খবর। (বরবরের কাগজে অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায় বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে না, সংখ্যালঘু বলে— কারণটি আমার ঠিক জানা নেই, সোজাসুজি সত্য কথাটি বলতে এক ধরনের সংকোচ হয় বলে মনে হয়।) মানুষের ওপর মানুষ যখন অত্যাচার করে তার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না, সেটি আরো অমানবিক হয় যখন সেটি হয় প্রতিকারহীন এবং একপক্ষীয়। আমি প্রতিদিনই আশা করছি যে কিছু একটা হবে, ক্ষমতাসীন কারো গুরুবুদ্ধির উদয় হবে, এই অমানবিক ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে, পুরো ব্যাপারটির অবসান ঘটানো হবে।

আমি দেখলাম অক্টোবরের ১৬ তারিখ বরট্রেমন্ত্রী ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করে দিলেন। ডেইলি স্টারের সংবাদ অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর এই অমানবিক বর্বরতার খবরগুলো ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (baseless, exaggerated and politically motivated)। দেশের শত শত নির্বাসিত এক কথায় তিনি উড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করলে না পেয়ে খিঁচিয়াবার বরটি পড়েছি, অন্য বরবরের কাগজও পড়ে দেখেছি, সত্যি সত্যি তিনি এই কথাটি বলেছেন। এ রকম অমানবিক মন্তব্য আমি এর আগে কখন তখনই চুট করে মনে করতে পারছি না। মানুষের প্রতি ভালোবাসাধীন এই বরট্রেমন্ত্রী আমাদের কার হাত থেকে রক্ষা করবেন?

বরট্রেমন্ত্রীর এই মন্তব্যটি কি একটি বিবেচনামূলক মন্তব্য নাকি অনেক চিন্তাভাবনা করে দেওয়া মন্তব্য সেটি আমি বুঝতে পারছি না। তার কথায় তিনি মোটামুটি পরিত্যক্ত করে বুঝিয়ে দিলেন, এই দেশে যদি কোনো হিন্দু নির্বাসিত হন তাহলে সেটি দেশের সমস্যা নয় সেটি তার নিজের সমস্যা। কারণ সেই নির্বাসিত হিন্দু আসলে দেশকে 'অস্থিতিশীল' করার জন্য এই 'মিথ্যা সংবাদটি' ছড়িয়ে সিঙ্ছেন। এটি কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়, এটি একটি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য'। বাংলাদেশ সম্ভবত এখন পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে হিন্দু হয়ে নির্বাসিত হওয়াটাই এখন অপর্যায়। কারণ এটি যদি কোনোভাবে কাগজে প্রকাশিত হয়ে যায়, সেটি হবে দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে। একটি রাজনৈতিক যন্ত্রণা হবে না— এটি হবে এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি ঘটনা। এই দুঃখ আমার কোথায় রাখি?

আমার যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে আমি বাংলাদেশের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হাত ধরে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ভাষণবাসানীন্দ্র আমানবিক মন্তব্যের জন্য কমা চাইতাম।

২. আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তারা কী কী দোষত্রুটির কারণে পরাজিত হয়েছেন এখন সবাই সেই তুলেচারা বিপ্রেষণে লেগে গিয়েছেন। তারা তাদের শাসনামলে বাংলাদেশকে সবচেয়ে চমৎকার যে জিনিসটি উপহার দিতে গেছেন আমি সেই কথাটির কথা বলি, সেটি হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (এ জন্য তাদের কম মূল্য দিতে হয়নি)। এক অর্থে এই সংবাদপত্রই হচ্ছে দেশের সকল অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। কোথায় জানি পড়েছিলাম, বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো- শুধু যারা ছুঁতে এবং দুর্বল জরায় সেখানে আটকা পড়ে, যারা সবল এবং শক্তিশালী তারা সেটি ছিঁড়ে বেয়ে যায়। আমাদের দেশের জন্য এটি অন্ধুর অন্ধুরের সতি, পুরো ব্যবস্থাটি ভেঁরি করা হয়েছে দুর্বলকে আটক করে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য। এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই বিচারের কোনো আশা নেই, পুলিশ পুরোপুরি সরকারের হাতে, আগে ব্যাপারটি প্রকাশ করা নিয়ে এক ধরনের শালীনতা ছিল- এখন আর নেই, তাদের জিজ্ঞেস করার আগেই তারা পরিষ্কার স্বীকার করে ফেলেন। দেশের সকল অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে এই সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রে অতিরঞ্জন হয়। রূপকণে খবর ছাপিয়ে তার কাটকি বাড়ানো হয়। নিরপেক্ষতা নামে একটি নতুন শব্দ আবিষ্কার করা হয়েছে, ন্যায় এবং অন্যায়ের মাধ্যমিকি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়- কিন্তু তারপরও এটি আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। একটি খবরের কাগজের একটি সংবাদকে 'ভিত্তিহীন' এবং 'অতিরঞ্জিত' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সবকটি সংবাদপত্রের দিনের পর দিন সবকটিই খবরকে, সম্পাদনীয়কে, আলোকচিত্রকে ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং রাজনৈতিক অসং-উদ্দেশ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি কেউ উড়িয়ে দেন, তার কথা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না, তিনি এক মুহূর্তের মতো দেশের সকল সচেতন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এটি জানেন না, নাকি জেনেওনা খুব চিন্তাজনক করে এটি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

গত কয়েক সপ্তাহ আমি খবরের কাগজ গড়তে পারছি না, খবরের হেড লাইনে চোখ বুলাই কিন্তু ভেতরের অংশটা পড়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারি না। বুকের ভেতরে এক ধরনের রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষগুলোর শুধু তিন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে এক ধরনের অমানবিক বর্বরতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং আমরা শুধু চোখ মেলে সেটি দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছি না এই গভীর অপর্যাবোধে আমি জর্জরিত হতে থাকি। আমার হিন্দু ছাত্র, সহকর্মীদের দুহের দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করি তাদের ভেতরে গভীর কোনো দুঃখ-ক্লেশ-

যন্ত্রণা লনা বেঁধে উঠছে কি না। তাদের সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, এই দেশে ঠিক আমার মতোই তার সমান অধিকার, আমার কথায় যদি সমবেদনা বা করুণা প্রকাশ পেয়ে যায়- একজন মানুষকে এর চেয়ে বড় অপমান আর কীভাবে করা যায় ?

গত কয়েক সপ্তাহ থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইছি কিন্তু পারছি না। গত কয়েকদিন থেকে আমার স্নেহবস্ত্র ভরা চিঠি-খবরের কাগজ থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি কিন্তু এই চিঠিরতো তো না পড়ে আমি রেখে দিতে পারি না। আমাকে যারা চিঠি লিখে তাদের বেশিরভাগই কম বয়সী শিশু-কিশোর-তরুণ। এক ভয়ঙ্কর অমানবিক নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে তারা বিশেষভাবে- কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে বুঝতে না পেয়ে তারা আমার কাছে চিঠি লিখে। সেই চিঠিগুলো আমি একটি একটি করে পড়ি। মাঝে মাঝে খানিকটা পড়ে বন্ধ করে রেখে দিই, একই পর আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে আবার খানিকটা পড়ি। তারা আমার কাছে জানতে চায় তারা কী দোষ করেছে যে, এই দেশে তাদের স্থান নেই ? একজন লিখেছে, '...এ দেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন আপনার মাধ্যমে সরকারকে জানাতে চাই যে, একটা চুক্তি করুক এই সরকার ভারতের সঙ্গে, ভারতের সব মুসলমান বাংলাদেশে এবং এ দেশের হিন্দুরা ভারতে চলে যাবে। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা কার কাছে চাইবে ?...' মানুষ না জানি কত দুঃখে এই কথাগুলো লেখে।

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বিনীতভাবে জানাতে চাই, খবরের কাগজের এই তথ্যগুলো ভিত্তিহীন-অতিরঞ্জিত নয়, খবরগুলো সত্যি। রাজনৈতিক বিশ্লেষণের খুব সুন্দর করে সুখিরে দিচ্ছেন 'সংখ্যালঘু' আসলে আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' এবং এই ছোট্ট একটি শব্দ ব্যবহার করে তাদের সকল পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের নামহীন, পরিচয়হীন, সুখ-দুঃখ-কষ্টহীন, অধিকারহীন, ভালোবাসাহীন পরিসংখ্যানে পাটে দিল। এ দেশে এখন তারা শুধু একটি সংখ্যা।

৩.

নির্বাচনের পর আমাদের নির্বাচন কমিশনার এম এ সাইদ বলেছেন, শাসনায়িক দাঙ্গা এ দেশে নতুন কিছু নয়। সমান সমান দুই দল যখন একে অন্যকে আক্রমণ করে সেটিকে বলে দাঙ্গা। বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে যা হচ্ছে সেটি দাঙ্গা নয়- সেটি হচ্ছে নির্ধাতন। এখানে এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে যাচ্ছে- অসহায় মানুষ পাঁটা আক্রমণ করে প্রতিরোধ করতে না। মনে হচ্ছে এম এ সাইদ বাংলাদেশের প্রকৃত তথ্যটি জানেন না, দাঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করলে দুই দলকে সমান দোষী করা হয়। যে যারচে এবং যে যার বাচ্ছে দুজনই দোষী হতে পারে না। বৌকায় ভোট দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় কারো কারো চোখে দোষ করে থাকতে পারে, কিন্তু সে জন্য তারা দাঙ্গা করছে বলা যায় না।

৪.

আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করছি সেটি একটি আধুনিক পৃথিবী। এই পৃথিবী খুব ছোট। এখানে আমরা সবাই সবাইকে চিনি। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর প্রিয়জন হারানো ব্যাকুল ভয়াবহ মহিলাটিকে আমরা ধূলিধূসরিত নিউইয়র্কের রাস্তায় ছুটে যেতে দেখেছি। আবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে আফগানিস্তানে বোমা ফেলা হয়েছে সেই বোমাবিক্ষত ধ্বংসস্থলে হতচিকিত বিজ্ঞান্ন আতঙ্কিত ফুটফুটে শিশুটিকেও আমরা দেখেছি। কৌশলী গণমার্যাম আমাদের যেটাই বোঝানোর চেষ্টা করুক, মানুষের ব্যাকুল ভয়াবহ হতচিকিত আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি দেখে আমরা সত্যি কথাটি বুঝে যাই, আমরা সবাই মানুষ এবং আমরা আজ খুব বিপদের মাঝে আছি। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা মানবতার বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করে আসছিলেন- তারা যেটি পারেননি বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী আর প্রযুক্তিবিদরা সেটি করে ফেলেছেন। মহাকাশে উপগ্রহ, মহাসাগরের নিচে সাবমেরিন ক্যাবল, তথ্যপ্রযুক্তি আর তার পেছনের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মানুষগুলোকে মানবতা নামে সেই অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে ফেলেছেন। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হেরকম মানুষ সোঁকার হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন সারা পৃথিবীতে মানুষ সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে পথে নেমে আসে।

এই নতুন পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। এটি একটি পুরাতন অচল অস্ত্র, এক সময় এই অস্ত্র ব্যবহার করে পৃথিবীতে অনেক অবিচার করা হয়েছে কিন্তু তার দিন শেষ হয়ে আসছে। কেউ মনে এই অস্ত্র ব্যবহার করে, সে খুব সাময়িক একটা সুবিধা পেতে পারে কিন্তু তার ফলে চোখের পলকে নিজের দেশকে একশ বছর পিছিয়ে দেবে। নির্বাচনের পর আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অমানুষিক নির্যাতনের মাঝে ফেলে দিয়ে কার কী লাভ হয়েছে আমরা জানি না, কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশের যে কী ভয়ানক একটা ক্ষতি হয়েছে সেটি কেউ বুঝতে পেরোছে কি? এর মূল্য একদিন আমাদের দিতে হবে, সেই মূল্য হবে গভীর।

আমাদের বেঁচে থাকতে হলে নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে আর নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হলে সবার আগে সাম্প্রদায়িকতাকে আস্তানুড়ে ছুঁড়ে ফেল দিতে হবে। কেউ যদি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় কিছু যোবার আগেই দেখাবে, সেটি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে তাকে ধ্বংস করতে ফিরে এসেছে। নিজের ধর্মের জন্য মমতা আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিস নয়- অন্যের ধর্মের জন্য যার শ্রদ্ধাবোধ নেই সে কেমন করে নিজের ধর্মকে ভালোবাসবে? ঢাকায় বসে বড় বড় মহৎ কথা উচ্চারণ করা আর দেশের এদেশেরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে সেটির প্রতিফলন ঘটানো এক কথা নয়। দুর্গাপূজা আসছে, খবরের কাগজে দেখছি সেটি যেন 'সাড়বরে' পালন করা যায় তার 'প্রস্তুতি' নেওয়া হচ্ছে- আমরা পরিচিত একজনকে আসন্ন পূজার জন্য আশ্রম গমনের জন্যে গিয়ে আমি ধর্মতত্ত্ব খোঁজে পিয়েছি। তার কাছে জেনেছি এই পূজায় তাদের কোনো উৎসব নেই।

পৃথিবীর সৌন্দর্য হচ্ছে বৈচিত্র্য- পৃথিবীর শক্তিও হচ্ছে বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বৈচিত্র্য খুব কম- আমাদের সবাই এক রকম, আমি তাই বুদ্ধজের মতো সেই বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়াই। আমার বড় ইচ্ছা করে নৈদৈনিক কাজকর্মে আমি আমার চারপাশে অন্য ধর্ম, অন্য সংস্কৃতির মানুষ খুঁজে পাই। তাদের উৎসব, পূজাপার্বণে অংশ নিই, তাদের ভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাদের নূর ঠেলে রেখেছি- একটা বিশাল শক্তিকে অব্যবহৃত করছি। আধুনিক পৃথিবীতে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমাদেরও যদি আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ হতে চাই তাহলে সবার আগে আমাদের দেশের সেই অল্প কয়েকজন ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫.

আগেই বলেছি আমি প্রচুর চিন্তি পাই, আমার কাছে যারা চিন্তি লিখে তারা বেশিরভাগই শিশু-কিশোর এবং তরুণ। যারা কম বয়সী তারা কোনো কিছু নিয়ে ভাব করে না, তাই তাদের চিন্তিগুলো হয় আত্মীয় রকম সহজ-সরল। এক হিসেবে আমি খুব সৌভাগ্যবান- সাধারণ মানুষেরা রেডিও-টেলিভিশন ও খবরের কাগজ থেকেও যেটা জানতে পারে না আমি অনেক সময় ব্যক্তিগত চিন্তি থেকে সেটা জেনে যাই। দেশের একজন অন্যতম ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচারে নির্বাসিত হয়েছে এমন একজন মহিলার ছোট মেয়েটি আমাকে চিন্তি লিখে তার কষ্টটা জানিয়েছিল- সে কোনো বিচার চায়নি, কারো সঙ্গে তার দুঃখটা ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল। পরিবারের কেউ মারা গেলে আশ্রয়ভিক্ষার যেরকম একত্র হয়ে দুঃখটা ভাগাভাগি করে নেয়, অনেকটা সে রকম। সবার চিন্তিতেই দুঃখ-কষ্ট থাকে না, বেশির ভাগই থাকে আনন্দের এবং স্বপ্নের। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমার এই সরাসরি যোগাযোগের কারণে আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পাই।

কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে আমি সেই চিন্তিগুলো বলতে ভয় পাচ্ছি- আগে কখনোই এরকম হয়নি। খামের উল্টো পৃষ্ঠায় কিংবা চিঠির নিচে বাংলা নাম দেখালেই আমার বুক বেঁপে উঠেছে। চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যায়। কেউ কেউ নাম লিখে নেটি আবার কেউ দিয়েছে, এক ধরনের আতঙ্ক যদি কোনোভাবে তার নামটি প্রকাশ পেরে যায়, তখন তার কী হবে? নিজের প্রতি একটা লজ্জা, একটা অপরাধভারের আমি নিশ্চয়ই বোধ করি।

মানুষ একটি বয়সে পৌঁছে গেলে ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে অধিকারকে গ্রহণ করতে শিখে যায়, বুকের ভেতরে কোভেজ পুড়ে রেখে মুখ বুজে বেঁচে থাকতে শিখে যায়। কিন্তু ছোট একটি শিশু বা কিশোরের জন্য সেটি সত্যি নয়- এটি তাদের স্বপ্ন দেখার সময়, এমন কেন তারা অধিকারকে পৃথিবীর প্রচলিত নিয়ম হিসেবে মেনে নেবে? তারা কেন স্বপ্ন দেখবে না? শুধু ঘটনারূপে এই দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে জন্ম নিয়েছে বলে কেন তারা সব সময় বুকের ভেতরে একটা আশ্রয় নিয়ে বেঁচে

থাকবে? অকারণ লাঞ্ছনা-অপমানের ভয়ে শ্রিয়মাণ হয়ে থাকবে? একটি কম বয়সী পাক্ষা যখন আমাদের এই প্রশ্ন করে, আমি অবাক হয়ে আবিহ্ব্যত করি যে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি না। এক গভীর অপরাধবোধের কারণে আমি চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারি না।

কিন্তু এর উত্তরটা আমাদের বুজে বের করতে হবে- আমার মনে হয় যেসকল একটি কম বয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আমাদের এরকম একটি প্রশ্ন করেছে, ঠিক সেসকল একটি কমবয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আবার আমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমাদের দেশের এই নতুন প্রজন্মকে বড় করতে হবে আধুনিক পুণিবীর আধুনিক মানুষ হিসেবে। তারা বুকের ভেতর একটি ছোট্ট কোঁটার শুধু নিজের ধর্মের মানুষের জন্য ভালোবাসাকে লালন করবে না, তাদের বুকের ভেতর থাকবে সবার জন্য ভালোবাসা, সবার জন্য সম্মানবোধ। সেসকল একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যদি আমাদের কারো কিছু করার থাকে, আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এখনই, এই মুহুর্তে।

আসন্ন দুর্গাপূজার উৎসবে যারা অংশ নেবে তাদের সবার জন্য গভীর ভালোবাসা জানিয়ে আমি বলতে চাই, মানুষের ওপরে কেউ যেন বিশ্বাস না ছাওয়া। প্রতিটি দুর্গুত্তের পাশাপাশি এই দেশে এখনো লাখ লাখ সচেতন মানুষ আছে- তারা এই দেশের দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন। আগেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে।

প্রথম আলো

২২ শে নভেম্বর ২০০১

স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে কল্পনা করলেই আমার সামনে একটি দৃশ্য ফুটে ওঠে। আমি দেখতে পাই, জোর হয়েছে আর দূশে দলে তরুণ-তরুণীরা ছোট ছোট মোটর সাইকেলে বের হয়েছে। তারা সুন্দর কাপড়-জামা পরেছে। তারা আধুনিক, তারা ষাট। তারা রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানক্ষেত। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় ট্রাফিক লাইট লাগ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মোটর সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন দেখা গেল, ছোট বাস্কারা গুটি গুটি পায়ে রাস্তা পার হচ্ছে। তাদের পিঠে বইয়ের ব্যাকপ্যাক কিন্তু কেউ বইয়ের ভাগে কুঁজো হয়ে নেই। তারা চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, তাদের স্বাহ্যোচ্ছল চেহারা। ছোট মেয়েদের চুলগুলো ঝুটি করে লাল রিবন দিয়ে দুপাশে বাঁধা। মোটর সাইকেলে বসে থাকা কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা সব্বেষে হুলে যাওয়া বাস্কারার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা ট্রাফিক সিগন্যাল আবার সবুজ হওয়ার জন্য বৈধ ধরে অপেক্ষা করে। দুই তাদের অক্ষি দেখা যাচ্ছে। সবুজ ধানক্ষেতের মাঝে আধুনিক একটি বিকিং। মিল্ল শহরের সুউচ্চ গলান নয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চমৎকার একটি স্থাপত্যশিল্প। ছাদের ওপর বড় একটি এলেনা উপগ্রহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণ-তরুণীরা ঘড়ির দিকে তাকায় একজন আরেকজনের দিকে তাকায়, তাদের চোখেমুখে একমাত্রা, সতেজ উৎসাহের ছাপ। এ রকম সমগ্র ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেল। তরুণ-তরুণীরা আবার তাদের মোটর সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল। এরা সবাই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম- এরা সবাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

আমি নিশ্চিত, সবাই আমার স্বপ্নের কথা শুনে খানিকটা কৌতুক অনুভব করবে। পরিসংখ্যান হিসাব, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ফেঁদে ফেলা যায়, তখন আমি কেন একটি কাল্পনিক দৃশ্যকে আমার স্বপ্ন হিসেবে দেখতে চাই? তার কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, আমার স্বপ্নের ফ্রেমটি ঢাকা শহর নয়, এটি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। দেশের উন্নতির কথা বললেই আমরা ঢাকা শহরের কথা বলি। জাভা কুস, জাভা কলজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যা কিছু জাভা তার সবকিছু ঢাকা শহরে। আমি যখন বাংলাদেশ দিকে স্বপ্ন দেখি তখন সেটি শুধু ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, আমি সেটি পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে দেখতে চাই।

কেউ লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, আমি কয়েকবার বলেছি দুপাশে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত। ধানক্ষেত আমার জারি প্রিয় একটি জিনিস, সেটি একটি কারণ; এবং দুপাশে ধানক্ষেত বলে আমি বোঝাতে চেয়েছি এটি শহরের স্বাক্ষরানে নয়, এটি গ্রামাঞ্চলে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি শুধু যে ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না তা নয়, সেটি বাংলাদেশের একেবারে নিম্নতম একটি গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। দুপাশে ধানক্ষেতের কথা বলে আমি একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখছি যখনো শুধু স্বপ্নসংস্পর্শ

বাংলাদেশের নয়, বানো উদ্বৃত্ত বাংলাদেশের। একবার আমার একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে একজন কৃষককে সম্মান করে একটি শূরভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধান চাষ করে শুধু তার গ্রাম থেকেই সব কৃষক মিলে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ধান বিক্রি করেন। বাংলাদেশের ৩০ হাজার হািমের সবাই যদি এ রকম ধান উৎপাদন শুরু করে দেন, তাহলে কি আমাদের শুধু গার্মেন্টস আর তথ্যপ্রযুক্তির দিকে মূখ হতে চলে থাকত হবে? কাজেই কেউ যেন মনে না করেন আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের ধানক্ষেত শুধু সৌন্দর্যের জন্য, তার অন্য একটি ভূমিকাও আছে।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে মোটর সাইকেল করে ছুটে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের সবাই যে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে নিয়ন্ত্রিত তার কারণ দুটি। তার অর্থ প্রথমত, দেশের একবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজ্যঘাটেও ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সবাই সেটি মানছে। যারা ট্রাফিক আইন মানে তারা দেশের সব আইন মানে। কাজেই আমার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে আইনের ওপর শ্রদ্ধাশীল একটি প্রজন্ম, তারা হবে সুনাগরিক।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে যে কথাটি সবচেয়ে বেশিবার বলেছি, সেটি হচ্ছে কনবায়সী তরুণ-তরুণী। তরুণ-তরুণী মাত্রই কনবায়সী হয়, কিন্তু তবু যে ইচ্ছে করে কনবায়সী শব্দটি ব্যবহার করেছি তার একটি কারণ আছে। তথ্যপ্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তি পৃথিবীর সব জায়গাতেই কনবায়সী তরুণ-তরুণীরা, এবং আমি স্বপ্ন দেখি এ দেশের বেলায়ও সেটি সত্যি হবে। তার অর্থ আমাদের দেশের কলেজ-বিদ্যালয় থেকে যারা বের হবে তাদের সুদীর্ঘ সেপনজটে আটকে থাকতে হবে না, তারা ঠিক সময়মতো পাস করে বের হবে। আমার ভাবতে আছে একই সঙ্গে অবাক ও মুগ্ধ লাগে, যে জিনিসটি পৃথিবীর সব জায়গায় একটি অভিব্যক্তির ব্যাপার সেটি নিয়ে আমাদের এখনো স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কিনা আমরা কেউ জানি না।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা খুব ভোরে তাদের কাজ বের হয়েছে। এর অর্থ তারা পরিশ্রমী, কাজ করার একটি নতুন ধরনের সংকীর্ণে তারা অভ্যস্ত। তাদের চোখমুখ উৎসাহ ও একপ্রকার ঝলমল করছে। একটি দিন শুরু করার আগে তাদের চোখমুখে বিজ্ঞানবিরক্তি নেই, কারণ তারা অগ্রহ নিয়ে দিনটি শুরু করতে যাচ্ছে। তারা স্বীকারে সেটি তারা জানে, বীজাব্যবহার সেটিও জানে। তারা শিক্ষিত, তারা বাঁচি তথ্যপ্রযুক্তির দিকে। যার অর্থ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক, আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যব্রীদনের লেখাতে পারছি।

এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, পড়াশোনার ব্যাপারে আসলে কোনো শর্টকাট নেই। তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলতে হলেই আমরা যে ভারতবর্ষের উদাহরণ নিই সেই ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি সমানভাবে বিকশিত হয়নি। যেসব প্রান্তিক সত্যিকার অর্থে দীর্ঘদিন থেকে পড়াশোনার একটি ঐতিহ্য নড়ে উঠেছে সেখানে এই তথ্যপ্রযুক্তিও পাড়ে উঠেছে। যারা প্রাথমিক স্তরে, মাধ্যমিক স্তরে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে, কলেজে চিকিত্সক পড়াশোনা করেছে, তাদের সূজনশীলতা দেখানো হয়েছে, তারা শুধু যে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়েছে তা নয়, তারা অন্য সবদিক দিয়েও উৎকর্ষের চিহ্ন দেখিয়েছে। কাজেই আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের উৎসাহী-আগ্রহী তরুণ-তরুণীরা একপ্র

মুখবলের পেছনে একটি অনেক বড় ইতিহাস রয়েছে। এর অর্থ দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা তেলে সাজানো হয়েছে, এর অর্থ দেশে চমৎকার একটা শিক্ষানীতি রয়েছে, এর অর্থ দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, এর অর্থ মুখস্থ না করে তারা সূজনশীলতা শিখবে, এর অর্থ তারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হয়েছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির জটিল অগত্রে তারা এত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে, এত সহজে সেখানে সফলতার চিহ্ন রাখতে পেরেছে।

সবাই নিচয়ই লক্ষ করেছেন, আমরা হস্তের বাংলাদেশে তরুণ ও তরুণীরা সমানভাবে এগিয়ে এসেছে। দেশের অর্ধেক মানুষই মেয়ে। কাজেই যেদিন আমরা শেষে বাংলাদেশের সব কাজে সমানসংখ্যক পুরুষ আর মহিলা সেদিন বুঝতে পারব আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারছি। আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে সব কাজেই মেয়েরা ছেলের সমানভাবে এগিয়ে এসেছে। শুধু যে সমানভাবে এগিয়ে এসেছে তাই নয়, তারা জোরবেলা মোটর সাইকেল চালিয়ে কাজে রওনা দিয়েছে। আধুনিক বাংলাদেশে এর রকম একটা ছবি কল্পনা করতে আমি জানেবাসি। এ রকম একটা দৃশ্যের আরো একটি অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে ধর্মাত্ম মৌলখানীর কোনো স্থান নেই, তারা দেশের মেয়েদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারবে না।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের কনবায়সী তরুণ-তরুণীরা মোটর সাইকেল করে কাজ যাচ্ছে, যার অর্থ তারা কাজ করে যে অর্থ আয় করছে সেটি দিয়েই খুব তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল কিনতে পারছে (শুধু তাই নয় এত সহজে যে মোটর সাইকেল কিনতে পারছে, তার অর্থ দেশে মোটর সাইকেলের ইণ্ডাস্ট্রি হয়েছে, বাংলাদেশ মোটর সাইকেল তৈরি করছে)। এত সহজে একজন কনবায়সী তরুণ কিংবা তরুণী যে মোটর সাইকেল কিনে ফেলতে পারছে তার অর্থ নিচয়ই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমরা সেটি আলাদা করতে পারছি, তাদের কোম্পানির বিভিন্নত্রে ওপর কিসে রাখা বিশ্রাম এটেনা দেখে। বাইরের পৃথিবীর কাজ করা হচ্ছে, সেজন্য উপগ্রহ ব্যবহার করে তথ্য আনা-নেওয়া করছে। তারা সরে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বানানো হয়েছে। কিন্তু তারা শুধু মোটর ওপর ভরসা করে নেই, বাংলাদেশের মানুষ উপগ্রহ ব্যবহার করছে। কারণ এর মধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়ে গেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণের আগে আরো অনেক স্বপ্ন পূরণ হতে হয়। নিজেদের জনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে দরকার হবে প্রবাসী প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য। আমি স্বপ্ন দেখি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। আমাদের এখানে অসংখ্য দক্ষ প্রোগ্রামার রয়েছে, তারা সঙ্গে দরকার ডিজাইন অর্কিটেক্ট, সিস্টেম এনালিস্ট, হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ডাটাবেস, কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্কিং ডিজাইনার-এ ধরনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এ দেশে একমুখ মানুষের সংখ্যা বলতে দেখে নেই। সত্যিকারের কাজের মাধ্যমে এরকম জনশক্তি তৈরি হয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ট্রেনিং সেন্টারে এদের তৈরি করা যায় না। এর একমুখ অসামান্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাহায্য। তারা দেশে ফিরে আসার জন্য শুধু প্রবল দেশপ্রেমের আশায় বসে থাকলে হবে না, তাদের এ দেশে কাজ করার একটি পরিবেশ তৈরি করে দিতে

হবে। তাই আমার স্বপ্নের একটি বড় অংশ হচ্ছে সেই প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনা, সে রকম একটি পরিবেশ তৈরি করা, রাষ্ট্রসভাভাষে একটি উদ্যোগ নেওয়া।

তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যারা জড়িত তারা কমবয়সী, তাদের সন্তানসেবাও ছোট। এ দেশে এনে তারা তাদের সন্তানদের ভালো লেখাপড়ার সুযোগটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইবেন। তাই যখনই আমি তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে হুপু দেবি, আমি তার পাশাপাশি চমৎকার কুলের হুপু দেবি, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের সৃজনশীল পরিবেশে গড়ে তুলবে। সে কুলগুলাে গুপু বড় বড় শহরে নয়, সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। জেরবেনা ছোট বাক্সের হাত ধরাধরি করে সে কুলে যাবে। কুল নিয়ে তাদের মাথা কোনো আতঙ্ক থাকবে না। সত্যি কথা বলতে কী, যেদিন কুল ছুটি থাকবে সেদিন ছোট শিশুদের মন ব্যাধি হয়ে থাকবে।

আমি ভবিষ্যতের বাংলাদেশের যে হুপু দেবি সেখানে সবাই যে এক ধরনের কাজ করবে তা নয়। এখন যে রকম অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হচ্ছে আছে এবং যে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হচ্ছে তারই সোনার হিরণি ধরিয়ে দেওয়ার হুপু দেখিয়ে জড়ি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং বছর যোয়ার আগেই তাদের যট্টে আশান্ত, অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণিত হওয়ার অনুভূতি নিয়ে তারা ফিরে আসছে, সেটি আর থাকবে না। সবাইকে প্রোগ্রামার হতে হবে, তা নতী নয়। যার যে ধরনের ক্ষমতা সে টিক সে ধরনের কাজ করার সুযোগ পাবে। যারা স্বল্পশিক্ষিত তারা হতো ডাটা এন্ট্রির কাজ করবে, যারা আরো দক্ষ তারা মাস্টারিভিজ্যতে যাবে, যারা আরো দক্ষ তারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করবে। আইটি সার্ভিস বলে একটি বিশাল ক্ষেত্র আছে, সেখানে অসংখ্য মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কমিউনিকেশন। কাজেই আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণদের একটি বড় অংশ হবে কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দক্ষ মানুষ। তারা ইন্টেলিজেন্স জাদুকর, তারা ফাইবার অপটিক্সের ওস্তাদ, তারা নেটওয়ার্কিংয়ের দক্ষ বেলোয়াড়। তারা কালের ঘোঁড়াকে রোবট তৈরি করে, তারা করার জন্য রোদ দিয়ে চমকে পাবে সেরকম গাড়ি বানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত গ্রাউন্ডের রেসিং প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। নতুন প্রজন্মের এই আধুনিক প্রযুক্তিবিদরা বাংলাদেশে হেট্রেনিক্স প্রযুক্তির একটি নতুন লিগেজের উন্মোচন করবে।

এসব ভূখণ্ডে প্রতিজ্ঞাবান তরুণরা পড়াশোনা করবে চমৎকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে, ব্যবসার ব্যক্তির গজিয়ে ওঠা ট্রেনিং সেন্টারে নয়। তারা নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন প্রযুক্তিতে প্রকৃত করে সত্যিকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশে একটি বিশাল জাতীয় আইটি ইনস্টিটিউট থাকবে, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সেখানে তাদের নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করবে। নতুন সহপ্রাঙ্গণের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এই জ্ঞানার্জন করে অসম্বল সম্পদশালী একটি দেশে পরিণত হবে।

ভারূপ্যে উজ্জ্বল বিবিধাকর এই নতুন প্রজন্মকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাই, আমি জানি এটি গুপু হুপু পুপু, এটি সত্য।

১১ নভেম্বর ২০০১

৫৬৩

চাই অসাম্প্রদায়িক নতুন প্রজন্ম

১.

আহমেদ হুসা আমার 'কলাম লেখক' পরিচয়টি খুব অপছন্দ করতেন। হুসা তাই যারা যাওয়ার পর টিক করেছিলাম আসলেই এই যেটামুটি অর্থহীন কাজটি আমি ছেড়ে দেব, কিন্তু নির্বাচনের পর পর আমাদের দেশে যা ঘটছে সেটি দেখে আমার মনে হলো হুসা ভাইয়ের বিদেশী আমার বিরোধাজন হয়ে হালও আমি আরো কয়েক দিন লিখি। তার কিছু কারণ আছে। কেউ যখন মারা যায় তখন তার সব শ্রিয়জনেরা একত্রে হয়ে কষ্টটা ভাগভাগি করে নেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে নিজেদের ভেতরে এক ধরনের সাধুনা বুজি পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে সেটি অনেকটা শ্রিয়জনের মৃত্যুর মতো। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের যখন মৃত্যু ঘটে তখন সত্যিকার মৃত্যুর খুব একটা পার্থক্য নেই। আমার মতো যারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মাটিতে কিছুতেই এই ঘটনাগুলো ঘটান উচিত হয়নি তাদের সঙ্গে মনে মনে দুঃখটা ভাগভাগি করার জন্য এই লেখা। অন্যের জন্য নয়, আমার নিজের জন্যই লেখা।

২.

আমি জানি না— আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে নির্বাচনের পর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্ধাতনের বড় খবর ছাপা হয়েছে সেই ভুলনয় লেখালেখি হয়েছে খুব কম। হতে পারে আমি নিজে যে কারণ পড়ি সেখানে যারা লেখেন তারা লিখছেন না— অন্য কারণে লেখা হয়েছে, সেখানে আমার দেশে পড়ছে না তার সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়, কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই ধর্মবিশ্বাস ফেলে বলেছেন যে, খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। আমাদের দেশে গুরুত্বের বা গাছকাটা নিয়েও সামাজিক আন্দোলন পড়ে থেলে হয় কিন্তু এই ভাষার ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক আন্দোলন মূলে থাকুক সেজন্য লেখালেখিও কেন হয়নি আমি ব্যাখ্যাটির কোনো ব্যাখ্যা বুঝে পাই না। খবরের কারণের মানুষেরা শুধু কারণের কাটটি বাড়ানোর জন্য এসব লিখছে না। আসলেই হিন্দুদের ওপর নির্ধাতন করা হয়েছে এটি আমরা সবাই কমবেশি জানি। সত্যি কথা বলতে কী, দারুখানে একটি সময় গিয়েছে যখন কারণের পুরো বনরটুকু ছিল হিন্দুদের ওপর (না হয় আগুয়ামী লীগের নেতাকর্মীর ওপর) নির্ধাতনের খবর। তারপরেও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে বেশি কথা বলেননি তার কারণটা কী? হতে পারে একবারে প্রথমেই বিএনপি সরকার এটিকে একটি রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে গ্রহণ করছে, কাজেই যারা সাধারণত লেখালেখি করেন তারা একটি বিপদে পড়ে গেছেন। কিন্তু একটা লিখলেই তাকে বিএনপি-বিরোধী এবং সহজ সমীকরণে আগুয়ামী লীগপন্থী বলে চিহ্নিত করে ফেলেবে বলে মুচিভ্রান্ত ছিলেন। যারা বিবেকবান মানুষ কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করেন তারা

কলামসংখ্যা ১ - ৩৬

৫৬১

আরো বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্যের জন্য খুঁকি নিতে চাননি, মর্মবেদনটুকু সহ্য করেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, যারা মনের দিক থেকে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি মানুষ তারা মনের যতনা সত্ত্ব করে হলেও হুগ করে ছিলেন কারণ তারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, তারা যুগ বুললেই বিএনপি সরকার আরো সহজে রাজনৈতিক অপপ্রচার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

সত্যিকারের কারণটি কী আমি জানি না, কিন্তু এ কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ভয়ঙ্কর একটি অমানবিক ব্যাপার নিয়ে সেরকম লেখালেখি হলো না। তার কারণে এই দেশের অনেক মানুষ মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। যে অন্যান্যটুকু হয়েছে সেই ব্যাপারটি নয়- অন্যায়টিকে যেভাবেই মনে নেওয়া হলো সেই ব্যাপারটিই হচ্ছে বড় কষ্ট। আমি নিজেকে এ দেশের একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে কল্পনা করে দেখছি যে, এরকম পরিবেশে আমার মনে নিচয়ই একটি গভীর অভিমানেবোধের জন্ম নিত।

৩.

আমি প্রায় ১৮ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। এই ১৮ বছরে বাংলাদেশের নামটি সে দেশের পত্রপত্রিকা আমি ১৮ বারও খুঁজে পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন তসলিমা নাসরিনকে মুরজাদ ঘোষণা করে তাকে মুত্যাদ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলো আমদান তরু করেছিল তখন সেই বরফটি প্রথমবার বাংলাদেশকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করেছিল। আগে পাশ্চাত্যের লোকজন বাংলাদেশকে চিনত না- দেশের নাম বলা পর অবধারিতভাবে দেশটির পরিচয় বলতে হতো। তসলিমা নাসরিনের ঘটনার পর সবাই বাংলাদেশের পরিচয় জেনে গেল কিন্তু সেটি ছিল আমাদের জন্য খুব লজ্জার একটি পরিচয়। আমরা জানি, আমাদের দেশের মানুষ একেবারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না- সেটি যদিও নিচ্ছেই হোক। এটিকে কোনোভাবেই মৌলবাদীদের দেশ বলা যায় না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কাছে আমাদের সেই পরিচয়টি ছাপ বার্য হয়ে গেল। দেশের নাশ লাগে আর্থনিক শিক্ষিত রুচিশীল সহনশীল মানুষের এতদিনের চেষ্টাকে খুলাস লুটিয়ে অল্প কিছু উন্নয়ন মৌলবাদীর প্রচেষ্টাই প্রাধান্য পেয়ে গেল। সবাই জেনে গেল, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে একজন মহিলা লেখককে নিগৃহীত করা হয় এবং মৌলবাদীদের অত্যাচারের তাকে দেশছাড়া হতে হয়, দেশের সরকার বা মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

এবারেও তাই হলো। আমরা জানি, অল্প কিছু দূর্বৃত্ত এই দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের সবার মুখে কিছু কালিমা লেগে দেওয়া হলো। সেই দূর্বৃত্তগুলোকে খুব সহজে খুব লজ্জা হতে দমন করা যেত কিন্তু সেটি করা হলো না। নির্বাসন কমিশনার বদলেন, এটা তো হবেই; তত্ত্বাবধায়ক সরকার বদলেন, এটা আমাদের গারিভ না; নব নির্বাচিত বিএনপি সরকার বদলেন, এটা হয়নি এবং সারা দেশের বিবেক বলে আমরা আমাদের যে রক্তপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের দিকে তাকিয়ে থাকি, তিনিও বিশেষ কিছু করতেন না। (অবশ্য এতদিনে আমরা জেনে গেছি, তিনি কোন ভাষায় কথা বলতেন সে ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না- 'বাংলাদেশে গীর্জাবী হোক' এই চমৎকার বাংলা বাক্যটির বদলে শেষে

তাকে বলতে হয় 'বাংলাদেশে জিন্দাবাদ'। কাজেই তার হাতের আলগেই কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।)

কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক দেশ, এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে থাকে- এমন অনুরা যখন তাদের দিকে ঘুরাজতে তাকায় তখন তারা কোথায় গিয়ে মুখ বুকাবে সেটি কেউ ভেবে দেখেছে? বিদেশের মানুষের মুখ উন্মুক্ত করার জন্য ছোড়াছাড়া দিয়ে কিছু কাজ করা হয়েছিল দুর্গা পূজার সময়। হিন্দুরা খুব আনন্দ করে পূজা করছে এমন করার জন্য রাষ্ট্রদূত বা বিদেশী কূটনৈতিক জাতীয় কিছু মানুষকে দেশের কিছু কিছু পূজাঘণ্টে নেওয়া হয়েছিল। দেশের পূজাঘণ্টাকে রাত্রিগতি সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেট তৈরি করে মাইক বাজানো শুরু করা হয়েছিল- প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হিন্দুরা যেন আনন্দ করে সেই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য জোর করে হলেও করতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায় আগে শুধু নির্মমভাবে বসে ছিল এখন ব্যাপারটি আরো বিকট হয়ে গেল, দেশের সুনামের স্বার্থে জোর করে হলেও তাদের আনন্দ করতে হবে। কী ভয়াবহ রসিকতা!

৪.

সৈয়দ ঢাকায় একটি মিছিলকে শাহবাগ থেকে প্রেসভারের দিকে যেতে দেখছিলাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্ধারিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মহিলা পরিষদের বেশ কিছু মহিলা যুগে কাপড় বেঁধে হাতে ফেটুন নিয়ে যাচ্ছেন। আমার চোখে পড়ল মিছিলটির পেছনেই একটি দোতলা বিআরটিসি বাস। হঠাৎ করে সেখি বাসের ভেতর থেকে মাথা বের করে একজন কুর্মিষিত অশ্রাব্য ভাষায় মিছিলের মহিলাদের গালিগালাজ করছেন। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য- নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস না করে বাব কোয়ার? ঢাকা শহরের মতো জায়গায় দল বেঁধে মিছিল করে যাওয়া কিছু মহিলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোতলা বাসের ওপর থেকে একজন মানুষ তুর্নিত কিছু বাক্য উচ্চারণ করার দুঃসাহস পেয়েছে সেটি কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা নয়। মানুষটি জানে সে এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে প্রকাশ্যে এরকম ভয়ঙ্কর একটি সাম্প্রদায়িক এবং অগ্নীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য এখন কেউ ভালো কিছু করবে না। দেশ এসম একটি দিকে মোড় নিয়েছে, যেখানে এই ব্যাপটি এখন প্রকাশ্যে বলা যায়, উপস্থিত মানুষেরা এখন একত্রিত করে না।

ঘটনাটি দেখে আমি শিহরিত হয়েছি, বাংলাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-নীক্ষা-কৃতি সবকিছুর কেন্দ্রস্থল ঢাকা শহরে প্রকাশ্যে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে দেশের একেবারে প্রভাব অক্ষণে কী হচ্ছে কেউ কী কল্পনা করতে পারে?

আমাদের অনেকের ধারণা দু-চারজন হিন্দুকে খুন করা, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, তাদের সহায়-সম্পত্তি, দোকানপাট লুট করে নেওয়া, তাদের মেয়েদের বেপ করাই হচ্ছে একমাত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাসন। ভুল, ১০০ ভাগ ভুল। উপরন্তু ঘটনামাত্রা যখন মটে শুধু সেগুলো জানাজানি হয়। কখনো কখনো সেগুলো খবরের কাগজে চলে আসে। কখনো কখনো পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, আইনের সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা জানতে পেরে শিহরিত হই, বেশির ভাগ সময়েই কিছু করতে পারি না- অসব ক্রোধে জর্জরিত হই। এই সাম্প্রদায়িক নির্বাসন হচ্ছে প্রকাশ এবং খুল নির্বাসন কিন্তু এর

পাশাপাশি আরো একটি নির্যাতন হয় চোখের আড়ালে। যেটি কখনো খবরের কাগজে আসে না। হিন্দু ধর্মের ব্যাং যখন তাদের প্রতি তুল্যভাবে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, সিঁথিতে সিনুর বিধবা হাতে শাখা দেখে যখন একটি অশালীন উক্তি ছুড়ে দেওয়া হয়, বাংলা নামটি হুনেই যখন ইন্টারভিউ খোঁজে একজন মানুষের বিরুদ্ধে সিঁচানো দিয়ে নেওয়া হয়, বংশ পরম্পরায় এ দেশে থাকার পরেও 'ভারতে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত' বলে যখন তাদের প্রতিনিয়ত ঘোটা দেওয়া হয়, পারিবারিকভাবে শিখে যখন ছোট একটি শিশু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অন্য একটি শিশুর সঙ্গে নিষ্ঠুর একটি ব্যবহার করে বসে সেগুলোও ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতা। একই রকম নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতার কথা বেউ প্রকাশ করলে পারে না, কেউ লিখতে পারে না। যারা এর ভুক্তভোগী তারা যেটি নিয়ে কারো কাছে অভিযোগ করতে পারে না, দীর্ঘকাল ফেলে সেই অপমান এবং যন্ত্রণাটুকু বুকের ভেতর পুঁজে রাখে। দেশের স্বরাজ্যন্ত্রী কোনোদিন এই সাম্প্রদায়িকতার কথা জানবেন না, এ ব্যাপারে কোনোদিন কোনো ধানায় জিভি করা হবে না। কোনো বরের কাগজে কখনোই এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে না, কখনোই এর জন্য মৌন মিছিল হবে না, অসম্মান হবে না। যারা ভুক্তভোগী এর ভয়ঙ্কর বিধি শুধু তাদের ভেতরটুকু কুরে কুরে খেতে থাকবে, তাদের প্রিয়মাণ করে তুলবে, বিশ্ব করে তুলবে।

৫. আমাকে একটি অনুষ্ঠানে একবার 'কলাম লেখক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আমি খুব অবাক এবং বেশ বিচলিত হয়েছিলাম। ('কলাম লেখক' বললেই আমার নামে সবজাতীয় দ্বিধাশেষী এবং নিম্নক বরনের একটি মানুষের ছবি ভেসে ওঠে!) আমার মুখে ঘটনার কথা শুনে প্রথম আলোর সম্পাদক জানাব মতিউর রহমান হেসে বলেছিলেন, 'আপনার একটি বই কয় কপি বিক্রি হয়? বড় জোর কয়েক হাজার। তার পাঠক আরো কয়েক হাজার। কিন্তু একটা পমিকা ছাপা হয় কয়েক লাখ, তার পাঠক আরো কয়েক লাখ। কাজেই আপনার বইয়ের পাঠক থেকে কলামের পাঠক কয়েক শত গুণ বেশি। আপনি যতই আপত্তি করেন কিছু করার সেই- সংসার হিসেবে আপনি প্রথমে কলাম লেখক, তারপর বইয়ের লেখক!'

একবারে অসংখ্য মুক্তি এবং সেই মুক্তি ফেনে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। ছফা ভাইয়ের প্রতি স্থান দেওয়া এবং লেখালেখি বন্ধ করার হচ্ছে কাজের পরও আমি আবার লিখছি, কারণ মনের কটাক্ষ কয়েক লাখ মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করার এই সুযোগ আমাকে আর কেউ দেবে না। হয়তো যারা আমার লেখাটি পড়ছেন তাদের কেউ কেউ হঠাৎ করে আমার সঙ্গে একমত হবেন। হয়তো তাদের মাঝে কেউ কেউ কম ব্যয়ী, ভয়ঙ্কর- হয়তো এই দেশে তাদের ভেতর থেকে একেবারে অসাম্প্রদায়িক একটি নতুন প্রজন্ম সের হয়ে আসবে- পৃথিবীর সব মানুষই যে এক সেটি বোধহার জন্য তাদের দেহকোষের ক্রমাগতম সংখ্যা ওনতে হবে না, একজন মানুষের দিকে তাকালেই তার চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, ধর্ম, অধিকৃত সবকিছু উপেক্ষা করে ভেতরের মানুষটিকে দেখতে পাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন নরসিংহাটী একটি সরকার ছিল যখন এই সম্পূর্ণ অমানবিক ব্যাপারটির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। নেলসন

ম্যান্ডেলার লেখা 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' বইটিতে তার খুব ফলস্বরূপী একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তারা কোনো কোনো মানুষকে বর্ণা কলার জন্য কালার ব্রাইড কথটি ব্যবহার করেছেন। আমরা সবাই জানি 'কালার ব্রাইড' শব্দটি মানুষের দেবার এক ধরনের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়, রেলিটার এক ধরনের ক্রটিস কারণে তারা কোনো রঙ দেখতে পারেন না। কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকাতে এ শব্দটি খুব মেহত্বের বিধু মানুষের জন্য ব্যবহার করা হতো যারা সঁজা সঁজা একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে মানুষের গায়ের রঙের বিভাজনটি দেখতে পাতেন না। তাদের কাছে নানা এবং কালো মানুষের হাতে কোনো পার্থক্য ছিল না- বলা যেতে পারে, তাদের গায়ের রঙটি যে ভিন্ন সেটি দেখার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। গায়ের রঙের পার্থক্যের ব্যাপারে তারা ছিলেন অন্ধ- কালার ব্রাইড। আমার বক্তৃতাতেই ইচ্ছা করে আমাদের দেশেরও নতুন প্রজন্ম হবে এরকম- যেহেতু এখানে আমাদের গায়ের রঙের পার্থক্য নেই, সেজন্য তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্য সবদিক দিয়ে তারা হবে অন্ধ! এই মুহুর্তে মনে হচ্ছে পৃথিবী দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ। ধর্মীয় বলতে আমরা যা বোঝাই তা নয়, মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সেই 'পার্থক্যটুকুতে' অন্ধ। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি কোনোমতের ভাষা, সমবেদন বা কক্ষণ নয়- একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে এক ধরনের উপস্থিতি যে, এই পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার- ঘটনাক্রমে এই দেশে এক ধর্মের মানুষ কত অন্য ধর্মের মানুষ বেশি। কিন্তু সেজন্য কারো অধিকার অবশিষ্ট বেশি বা কম নয়। নতুন প্রজন্ম বড় হোক সব ধর্মের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে। ধর্মের, সংস্কৃতির বা আচার-আচরণের বৈচিত্র্যটুকুর প্রতি গভীর কৌতূহল নিয়ে, গভীর শ্রদ্ধাভাবে নিয়ে।

এখানে কেউ কেউ বলছেন, আমাদের দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবরগুলো অতিরঞ্জিত- আমি তাদের হারত মুহমদ (সঃ)-এর একটি বাণী শ্রবণ করিয়ে দিতে চাই। (১) সেন্টেম্বরের ঘটনার পর একজন বেলনাহৃত মুসলমানের লেখায় আমি এটি প্রথমবার দেখছি, যদিও ঠিক এই কথাটি একটি ভিন্নরূপে নাথিলের কথায় থেকে অবশ্যই ইহুদিদের উদ্ধারকারী শিখলারকে নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।) কথাটি এরকম: একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানব জাতিতে হত্যা করার মতো। এই অত্যন্ত মানবিক কথাটির সুর ধরে বলা যায়, 'একজন' নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন করা, সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সন্ত্রাসবাদী করা সমস্ত মানব জাতিতে নির্যাতন করা তাদের সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সন্ত্রাসবাদী করার মতো। একটি অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার ঘটায় জন্য অসংখ্য ঘটনার প্রয়োজন হয় না। একটিও যদি ঘটে থাকে সেই ঘটনার জন্যও সবাইকে দাঙ্গালায়িত নিতে হয়।

যারা এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটির গুরুত্বটি ধরতে পারছেন না, তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন- তারা কি বুকে হাত নিয়ে বলতে পারবেন এই দেশে এরকম একটি ঘটনাও ঘটেছিল? যদি ঘটে থাকে, তাহলে আমার প্রশ্ন, সেটি কেন ঘটেছে? কেন ঘটতে দেওয়া হবে?

অন্যরকম বিজয় দিবস

আমি এই যুদ্ধের আমার বাসায় মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে লিখছি, আমার চারপাশে বইয়ের স্থূপ। লিখতে লিখতে হঠাৎ ইচ্ছে হলোই আমি হাত বাড়িয়ে বইয়ের স্থূপ থেকে যেকোনো একটি বই টেনে নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে পারি। ইচ্ছে হলে বইয়ের শেলফে হেলান দিয়ে পুরোটাই পড়তে পারি। আমার সামনে ছোট ছোট বাক্সদের লেখা অনেকগুলো চিঠি-ইচ্ছে করলে আমি সেই চিঠির কয়েকটার উত্তর লিখতে পারি। এখানে বসে বসে অনেককণ থেকে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শুনছি, ইচ্ছে করলে সেটি পাশে দিয়ে অন্য কিছু শুনতে পারি। আমার হঠাৎ করে চা খাওয়ার ইচ্ছে করলে রান্নাঘরে চুপোর ওপর কেটলিটা বসিয়ে দিয়ে ঘরে পায়চারী করতে পারি। কিছু একটা খাওয়ার ইচ্ছে করলে ফ্রিজ খুলে তার ভেতরে উকি দিয়ে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখতে পারি। ইচ্ছে করলে টেলিফোনটা টেনে নিজের কাছে এনে কোনো আপনজন বা পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যদি দেখি বইরে উপাল-পাখাল জ্যেৎম্বা, শার্ট চাপিয়ে দিয়ে স্নায়ুর নিজেই ইচ্ছেমতো হাঁটতে পারি, ডিপিআইমেটে গিয়ে স্যাবরেটরি ঘর খুলে কিছু অসামান্য সার্কিট নিয়ে ভারতে পারি।

আমার এই কাজগুলোর কোনোটিই এমন কিছু বড় কাজ নয় এবং আমি প্রতিদিনই এগুলো করছি। তবে এর মধ্যে এমন একটি পার্থক্যের জন্ম হয়ে গেছে। ২২ নভেম্বর শাহরিয়ার কবিরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ভেলখানায় আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকবার আমি যখন আমার দৈনন্দিন ছোট একটি কাজ করছি- আমার শাহরিয়ার কবিরের কথা মনে পড়ছে এবং নতুন করে উপলব্ধি করছি তিনি এই ছোট কাজটি করতে পারছেন না। খবরের কাগজে দেখছি তার মতো একজন সম্ভাবী মানুষকে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাধারণ অপরাধীর মতো কোর্টে নেওয়া হচ্ছে, পুলিশ রিমাও নামক একটা ভয়াবহ ব্যাপারে তৈলে দেওয়া হচ্ছে, আপনজন তার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, তাকে তার ডিভিশন না দিয়ে সাধারণ অপরাধীর সঙ্গে রাখা হচ্ছে এবং সব দেখে একটি গভীর বেদনা এবং ক্ষোভ অনুভব করছি। দেশের আইনকানুন স্বীকার করে কাজ করে সে সম্পর্কে আমার কোনো দারণা নেই, তাই তিনি কবে ছাড়া পাবেন সে সম্পর্কে আমার কোনো অনুমান নেই। শুধু জামি, তিনি এখনো ছাড়া পাননি এবং এবারের বিজয় দিবসেও এই মুক্তিযোদ্ধা মানুষটির সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস এবং দেশ ও দেশের মানুষকে ভুলোবাসার কারণে ভেলখানার ভেতরে আটকা পড়ে থাকবেন।

শাহরিয়ার কবিরের অনেকগুলো পরিচয় আছে। তিনি লেখক- আমাদের দেশে 'বাতাদের লেখক' ছাপ পড়ে যাওয়ার ভয়ে বড় লেখকেরা বাতাদের জন্য লিখেন না, কিন্তু শাহরিয়ার কবির দাঁতিন থেকে বাতাদের জন্য লিখে আসছেন। এই দেশের

কিশোর-কিশোরীদের দ্বয়ে শাহরিয়ার কবিরের একটি পাকাপাকি স্থান রয়ে গেছে। তার সাহিত্য কর্মের জন্যে তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি একজন সাংবাদিক এবং কলাম লেখক। চলচ্চিত্র মাধ্যমে তার খুব উৎসাহ। বাংলাদেশে মুক্তাপ্রাণীদের বিচারের জন্য তিনি নিরপসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হে, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই যুদ্ধের যে আমি কিংবা আমার মতো ১৩ কোটি মানুষ একটি স্বাধীন দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তার কারণ ৩০ বছর আগে শাহরিয়ার কবির এবং তার মতো অনেক মুক্তিযোদ্ধা এই দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের জীবন ঝুপে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ যতদিন টিকে থাকবে এই দেশের মানুষেরা ততদিন শাহরিয়ার কবির এবং অন্য সব মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করবে। কিন্তু যে মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরে বিজয় দিবসে এনে আমাদের বিজয় দিবস উদযাপন করার সুযোগ করে দিয়েছিল, বিজয় দিবসের দিনে সেই মানুষগুলোকে ছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহিতা নামে একটি উদ্ভট কটকল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত করে জেলখানায় আটকে রাখা হয় তাহলে সেটি নিশ্চয়ই হবে একটি অন্যরকম বিজয় দিবস।

২.

১৯৯৪ সালে আমি নিঃসঙ্গ গ্রহচাষী নামে আমার একটি বই শাহরিয়ার কবিরকে উৎসর্গ করেছিলাম। আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি। সেখান থেকে বাংলাদেশে শাহরিয়ার কবিরের অসাধারণ কিছু কাজকর্মের খবর পেয়ে বিশেষ করে একাত্তরের যীত নামে এটি অসাধারণ চলচ্চিত্রের বাহিনীকার হিসেবে পরিচয় পেয়ে এই মানুষটির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধের জন্ম হয়েছিল। আমার বেশিরভাগ বই কোনো উৎসর্গের ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে, হঠাৎ হঠাৎ কোনো একজন মানুষ আমাকে এত মুগ্ধ করে যে, তাকে তখন আমার কোনো একটি বই উৎসর্গ করে আমার কৃতজ্ঞতার কৃপা প্রকাশ করি।

শাহরিয়ার কবির বাতাদের জন্য লিখেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, বৈধমান এবং যুগি যুগাপ্রাণীদের এই দেশের মাটিতে বিচার করে দেশের কলঙ্ক মোচনোর জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ইতিহাসের একজন নিরলস গবেষক, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি জীবনপাত করছেন। যাত্রা কিছুদিন আগেও সার্ক দেশগুলো নিয়ে মৌলবাদবিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন পড়ে তোলার জন্য তিনি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছেন (ভোট পেতে সন্ধ্যা হবে ভেবে সার্কের প্রধানমন্ত্রী এটি উল্লেখেন করতে রাজি হননি বাবু জনস্বর্গিত আছে।), নির্বাচনের পর যখন এই দেশে হিন্দু সন্তোষায়ের ওপর একটা পৈশাচিক নির্ঘাতন শুরু হয়ে গেল এবং সবাই কী করবে বা কী বলবে সেটি নিয়ে একটা দ্বিধাভ্রমে ছিল তখন একটি নির্ঘাতিত বালিকাকে এনে সংবাদ সম্মেলন করে সবার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি নিজে আমার নিজের জীবনকে নিয়ে যে কাজগুলো করতে চাই কিন্তু সবসময় করতে পারি না- নিজের অক্ষমতা এবং দুর্বলতার জন্য, শাহরিয়ার কবির সেই কাজগুলো করেন, করতে

দ্বিধা করেন না। একটি স্বাধীন দেশে একজন সচেতন মানুষ এবং সাংবাদিকের যে বিশ্বাস থাকে উচিত তার সেই বিশ্বাসটুকু আছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সেই বিশ্বাসটুকুর জন্যই রাষ্ট্রপ্রতীহী মামলা নামক একটি উদ্ভট মামলার আটকে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে দেশের আরো বহুগুণ মানুষকে রাষ্ট্রপ্রতীহী মামলার বিচার করার জন্য বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কী হবে জানি না। তবে এই আনরকম বিজয় দিবসটিতে আমার একটি নতুন উপলব্ধি হচ্ছে, যে বিশ্বাসের জন্য শাহরিয়ার কবিরকে জেলে খেতে হয়েছে আমি এবং আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষ তো সেই একই বিশ্বাস তাদের বুকের মধ্যে পোষণ করে- তাহলে আমরাও কি দেশপ্রতীহী ?

৩.

একজন মানুষকে শ্রেষ্ঠার করার পর তাকে কীভাবে কোথায় নেওয়া হয় সে সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই। আইনের পুরো ব্যাপারটিকেই আমার কাছে বেশ জটিল মনে হয়- তবে খবরের কাগজে ধানার ওসি, লেফট ইন্সপেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের নাম উচ্চারিত হতে দেখছি। কোর্ট, সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে জেলে আটকে রাখার জন্য যে মানুষগুলোকে নানা ধরনের ভূমিকা রাখতে হয়েছে তাদের কাউকেই আমি জিনি না; সম্ভবত তারা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং সম্ভবত তারা মধ্যবয়স্ক এবং সম্ভবত তাদের কমবয়সী ছেলেমেয়ে আছে। যদি তাদের কমবয়সী ছেলেমেয়ে বেঁকে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, সেই ছেলেমেয়েরা শাহরিয়ার কবিরের ভক্ত পাঠক। এই ব্যাকাতলা যখন তখনই তাদের বাবা-মা শাহরিয়ার কবিরের মতো একজন মানুষকে রাষ্ট্রপ্রতীহী মামলার জেলখানার আটকে রেখে এসেছে, তখন তাদের ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে আমার খুব জানার ইচ্ছে করে। এই ছোট ছোট ব্যাকাদের বেনদাহত মুখের নামনে কৌতূহলী চোখের সামনে তাদের সোজাসাপটা প্রশ্নের উত্তরে এসব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কী বলেছেন সেটি জানার আমার খুব কৌতূহল।

খবরের কাগজ খুললে মনে হয়, দেশের আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটি মোটামুটি চুকেচুক গেছে। যারা লেহায়েৎ নির্বোধ- সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যারা এখনো দল পরিবর্তন করেনি তারা মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ছে। কজিকটা বকর, মাথাল্যাড়া মতি এই ধরনের বিভিন্ন নাম এবং ততোধিক বিচিত্র জীবন পদ্ধতির কারণে আমার কখনোই তাদের জীবনের মধ্যে নিজস্বের ইজো পাই না। এছাড়াও পুলিশ নিজের গরজে কিছু মানুষ ধরপাকড় করে, দেশের আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই- সেখানে উদ্দেশ্য পুরোপুরি যাবসায়ি- একজন শাসনো মানুষকে ধরে তার কাছ থেকে কিছু পরস্য উপার্জন করা। কয়দিন আগে আমার কাছে একজন ছাত্র এসেছে একটি নির্দিষ্ট দিনে- সে যে আমার রূপে উপস্থিত ছিল সেই কথাটি লিখে দিত। কার্য নিবর্তনের পর একটি গৃহমামলার তাকে আসামি করে দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির কারণে এই ধরনের মামলা-মোকদ্দমার অনেক সময়ই পুলিশ নিরুপায় এবং অসহায়। পুলিশ যেহেতু কিছু করতে পারছে না কিংবা

কিছু করতে চাচ্ছে না, তাই চাঁদাবাজ-মাজনদের টেকনের ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের নিজের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, তারা দলবদ্ধে বাঁশ-লাঠি নিয়ে তাদের ধাওয়া করছে। সাধারণ মানুষজন সম্পূর্ণ অমানুষ হয়ে গু-চারজনকে অবলীলায় খুন করে ফেলেছে।

এ রকম সময়ে আমরা হঠাৎ করে জানতে পারলাম শাহরিয়ার কবিরকে শ্রেষ্ঠার করা হয়েছে। শাহরিয়ার কবির 'কজিকটা বকর' নয়- তাই তার সঙ্গে আমরা একমাত্রা বোধ করতে পারি এবং পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তীব্র পুষ্ট অস্বস্তি বোধ করি। তাকে শ্রেষ্ঠার করার পুরো ব্যাপারটি দেশের আইনের প্রতি সম্মান রেখে করা হয়েছে কিনা সেটি নিচেরই স্ট্রিটটি বিবেচনা করে দেখা হবে কিন্তু অত্যন্ত সহজ কিছু জিনিষ আমাদের মতো আইনে অনতিক্রম মানুষদের পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে দেয়। শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগটি কী সেটি এখনো কারো কাছে পরিকার নয়। দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন- এ রকম একটি ভাষা-ভাঙ্গা কথা তুলতে পাই। আমরা দেখে এসেছি এই দেশের ধর্মতান এবং সাবক প্রধানমন্ত্রীরাও বিদেশীদের কাছে নিজের দেশ নিয়ে নালিশ করেছেন, হাইকমিশনার এবং অর্থমন্ত্রী বিদেশের মাটিতে হিন্দুদের নির্ধাতনের কথা বীকার করেছেন, পররাষ্ট্রকার্য কথা ছেড়েই দিলাম। এগুলো কটকেই যদি রাষ্ট্রপ্রতীহী না হতো হয় তাহলে শাহরিয়ার কবির কেন রাষ্ট্রপ্রতীহী হবেন।

আমার মনে হয় রাষ্ট্রপ্রতীহিতার সংজ্ঞাটি খুব পরিকারভাবে বলা দরকার এবং শাহরিয়ার কবিরকে যদি অভিযুক্তই করতে হয় তাহলে এর সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করা দরকার। এর আগেও যাদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারাও অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

৪.

বেদিন থেকে শাহরিয়ার কবিরকে আটকেই করা হয়েছে সেদিন থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করছি এর কারণটা কী। আমরা যেটুকু দেখছি এবং তবুই ভাঙে যেটুকু বুকেছি যে, শাহরিয়ার কবির একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব থেকে বেশি কিছু করেনি। তার কাছে নাকি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যের কাগজপত্র পাওয়া গেছে- সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু একজন সাংবাদিকের কাছে সব তথ্য থাকতে পারে, তাদের কাছই হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। সংসদে যখন দেশের আরো বহুগুণ মানুষকেও রাষ্ট্রপ্রতীহী হিসেবে বিবেচনা করে বিচার করার দাবি উঠেছে, তখন হঠাৎ করে মাঝগা ঘেন এই দেশের মাটিতে একটা অত্যাচারিতার চিহ্ন খুঁজে পেতে শুরু করছি। যুক্তিযুক্ত চলাকালীন পাকিস্তানের পাকসক মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রপ্রতীহী বলত- আজ ৩০ বছর পর আমরা হঠাৎ করে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আবার রাষ্ট্রপ্রতীহী বলা হচ্ছে? যুক্তিযুক্তক অতীতের একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। যারা সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক অর্থে জবাই করেছেন, তারা এই সরকারের সতী পর্যাঙ্কের মানুষ। সাকা সৌখুরী প্রধানমন্ত্রীকে কী উপদেশ দেন আমার জানার খুব কৌতূহল- মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি তার হাতে নির্ধাতিত হয়েছেন এ রকম

মুক্তিযোদ্ধাদের আমি চিনি। মনে হচ্ছে সব জায়গায় একটা চেহারা চলছে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশকে ভালোবাসার এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে একপেঁচ কালি মাখিয়ে দেওয়ার। শাহরিয়ার কবিরের ওপর ফোভটা একটু বেশি তার কারণটি কী? তিনি একান্তরের যাত্রক ও দালাল নির্মূল কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য, সেজন্য নাকি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর বর্বর অত্যাচারের পর অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে সংখ্যান সন্মেলন করে সারা দেশের মানুষের সামনে একটি সত্যি প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য?

সেই অনেক আগে পাকিস্তানের শাসন আমলে ও ধরনের ব্যাপার ঘটত। কারো কথা যদি শাসক শোঁতার পছন্দ না হতো অর্থ দিয়ে তাকে কিনে নেওয়া না যেত তাহলে ভয় দেখিয়ে তাদের খামিয়ে দেওয়া। এটাও কি সেই ধরনের একটি সঙ্কেত যে সবাই একটা মতক হও— সরকারের পছন্দের বাইরে কিছু করা হলেই দেশের আইন-কানূনের যে ফাঁক-ফোকর আছে সেগুলো ব্যবহার করে যেকোনো মানুষকে যেকোনো সময় ধরে জেলখানায় ঢুকিয়ে যতদিন খুশি রেখে দেওয়া যাবে। মানুষটি দেশের হত সম্মানিত ব্যক্তিই হোক, হাতে হাতকড়া দিয়ে কিছু ক্রিয়মানের সঙ্গে যতদিন খুশি আটকে রাখা যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটির মধ্যে একটি প্রতিহিংসার চিহ্ন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আমরা যে ধাক্কা অনুভব করছি সেটি থেকে আমরা সারা দেশের কথা অনুমান করতে পারি। আমি খুব আশা করছি যে, প্রাথমিক বাড়বাড়িটুকু সামলে নিয়ে সরকার সব ব্যাপারে তত্ত্বাবধির পরিচয় দেবে।

৫.

এবারে বিজয় দিবস এবং ঈদ ঘটনাক্রমে একই দিনে হতে পারে। শাহরিয়ার কবিরের একজন মেয়ে রয়েছে, যদি শাহরিয়ার কবিরকে এর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া না হয় তাহলে তার মেয়ের এই ঈদ এবং বিজয় দিবস একা একা করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব অসামাজিক মানুষ— ঈদের দিনে বৈঠক করে কারো বাসায় গিয়েছি মনে পড়ে না— কিন্তু এই ঈদে এবং বিজয় দিবসে নিশ্চয়ই শাহরিয়ার কবিরের বাসায় যাব। তার মেয়েকে বলে আসব দেশব্রহ্মের জন্য, সত্যি কথা বলার জন্য যদি কাকড়ে দেশব্রহ্মী হতে হয় তাহলে শাহরিয়ার কবির একা নন, এই দেশে আরো অসংখ্য 'দেশব্রহ্মী' রয়েছে। শুধু শাহরিয়ার কবিরকে একা বিচার করলে হবে না— এই দেশের আরো অসংখ্য 'দেশব্রহ্মী'র বিচার করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৪ ডিসেম্বর ২০০১

২০৩০ সালের একদিন

টুটুল অল্পগুলো শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সূর্য এর মাঝে হেলো পড়তে শুরু করেছে। সে ভাড়াভাড়ি খাতা বন্ধ করে রুমকে বলল, 'কনু চল।'

'আমার যে এখনো হোমওয়ার্ক শেষ হয় নাই।'
'এত দেরি করলি কেন? এখন কিছু করার নাই। শুভ, ঘিরে আসতে আসতে পরে অঙ্ককার হয়ে যাবে।'

অঙ্ককার করতী তখনই রুমর সুখে ভয়ের ছাপ পড়ল, সে ভাড়াভাড়ি তার বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চল।'

দুজন জুতো পরে রান্নাঘর থেকে নানা আকারের প্রাকটিকের বোতল তাদের ছোট টেলাগাড়িতে তুলে নেয়, তারপর দরজা খুলে বের হয়ে চিংকার করে বলল, 'আমু দরজা বন্ধ করে দাও।'

আমা এসে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'সাবধানে যাবি কিছু।'

টেলাগাড়িতে প্রাকটিকের বোতল নিয়ে দুজনে ছুটেতে থাকে, তাদের বাসা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে— একটি টিউবওয়েল থেকে সবাই পানি নেয়। একটু দেরি হলেই অনেক ভিড় হয়ে যাবে। রাস্তার মোড়ে সাইবার ক্যাফের সামনে এসে দুজন দাঁড়িয়ে পেল। জানালার পাশে ক্যাফের বুডো মজান মানুষটি থিমোচ্ছে। টুটুল গলা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কোনো ই-মেইল এসেছে চাচা?'

বুডো মানুষটা চোখ বুজে বলল, 'কে? টুটুল?'

'জী চাচা। আবুর কোনো ই-মেইল এসেছে?'

'মনে হয় এসেছে। আমি প্রিন্ট আউট নিয়ে রেখেছি। দাঁড়াও একটু দেখি।'

বুডো মানুষটা ডেক বেটে একটা ছোট কাগজের টুকরো বের করে বলল, 'এই যে। নাও।'

টুটুলের চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ পড়ল, সে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল। বুডো মানুষটা নরম গলায় বলল, 'ভোমার মাকে বলো খিলটা দিয়ে দিতে। দুমানের বিল বাকি পড়েছে।'

'বলব চাচা।'

কনু বলল, 'আবু কী লিখেছে ভাইয়া?'

'জানি না, বাসায় গিয়ে পড়ব। আর আগে পানি নিয়ে আসি।'

টিউবওয়েলের সামনে এর মাঝেই অনেক বড় লাইন, টুটুল আর কনু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে পানি ভরার সুযোগ পেল। টিউবওয়েলটি একা চাপতে কষ্ট হয়। টুটুলের সঙ্গে কনুও হাত লাগাল। কনু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মোটর লাগানো থাকলে সুইচ টিপলেই নিজে থেকে পানি উঠত, তাই না ভাইয়া?'

'হ্যাঁ।'

'মোটর লাগায় না কেন?'

'কেনন করে লাগাবে? ইলেকট্রিসিটি নাই যে!'

'ইলেকট্রিসিটি নাই কেন?'

'কেনন করে থাকবে? জেনারেটর চালাতে গ্যাস লাগে না?'

'ও! রনু চুপ করে গেল। সবাই জানে বাংলাদেশে কোনো গ্যাস নেই, যেটুকু গ্যাস ছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে পাশের দেশে রপ্তানি করে শেষ করে দিয়েছে।

পানির বোতলগুলো তাদের ছোট টেলাপাড়িতে করে ঠেলে আনতে আনতে টুটপ তাকিয়ে দেখল আশপাশের সব বাসা থেকে কুচকুচে কালো ধোয়া বের হয়ে যাচ্ছে। কাঠ, খড়, কাগজ, প্রাস্তিক জুলিয়ে সবাই রান্না করছে, তার কালো ধোয়ায় আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে। একটি পরেই মুঠু ভুবে বাবে, তার আগেই সবাই রান্না শেষ করে নিতে চাইছে।

টেলাপাড়িটা টেনে টেনে রান্নাঘরে তুলে এনে টুটপ আর রনু হাঁপাতে থাকে। না রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন, তার মুখে কালি-কুলি মাখা, ধোয়ায় চোখ মাল হয়ে আছে। টুটপ বলল, 'আসুব ই-মেইল এসেছে।'

'কী লিখেছে?'

'এখানে পড়িনি।' পানির বোতলগুলো থেকে ড্রামে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'পড়ব আশু?'

'রান্নাঘরে চলে আস।'

টুটপ আর রনু আবার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কংক্রিটের চুলোতে খড়কুটা, প্রাস্তিক আবর্জনা জ্বলছে, গলগল করে কুচকুচে কালো ধোয়া বের হচ্ছে, রান্নাঘরের ভেতরে একটি তীব্র বাষ্পাভা গন্ধ। আশা চুলোর ভেতরে আরো কিছু আবর্জনা ফেলে দিলেন। ধোয়ার দমকে তার কাশি উঠে গেল, খক খক করে কাশতে কাশতে হঠাৎ তার ছোদেবলার কথা মনে পড়ে গেল। তাদের বাসায় তখন গ্যাসের চুলা জ্বলত। কী সুন্দর নীল আগুন, এতোটুকু ধোয়া নেই। নব ঘুরলেই জ্বলত আবার নব ঘুরলেই নিবে যেত। আশা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন-মাত্র ২০-২৫ বছর আগের কথা, অথচ সেই দিনগুলোকে এখন স্বপ্নের মতো মনে হার।

টুটপ পকেট থেকে কাগজটা বের করে বলল, 'পড়ব আশু?'

'হ্যাঁ পড়।'

টুটপ পড়তে শুরু করে:

সোনা মনি টুটপ এবং রনু,

আমার এখনো বিধান হচ্ছে না যে, তোমাদের ৬ মাস হলো নির্ধনি। পরবর্তীকালী
দুটির জন্য বসে আছি, তখন তোমাদের দেখতে আসব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো,
তোমাদের না গেলে আমার একটি মুহূর্তও কাটে না। কিন্তু তবুও এই দেশে পড়র
মতো খাটিক কারণ বাংলাদেশে এখন কোনো সারু নেই, কোনো চাকরি নেই।

যখন মনে হয় যে, বাংলাদেশও এরকম একটি দেশ হতে পারত তখন আমার বুব
দুঃখ হয়। কিন্তু ২০ বছর আগে দেশের সব গ্যাস রপ্তানি করে দিয়ে দেশটাকে
সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে।

এখানে আমি যখন একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বালাই তখন আমার মনে হয়
আমাদের দেশেও ইলেকট্রিসিটি থাকতে পারত। যখন রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা
জ্বলিয়ে রান্না করি তখন মনে হয় বাংলাদেশের মানুষও তাদের গ্যাস ব্যবহার
করতে পারত। আমি রাগে ভ্রাত অস্থ হয়ে যাই, যখন মনে পড়ে আজ থেকে প্রায়
২০ বছর আগে আমাদের দেশের গ্যাস এই দেশে রপ্তানি করে দিয়েছে, এই
দেশের মানুষ সেই গ্যাস জ্বালিয়ে শেখ করেছে এখন আমাদের জন্য এবং
তোমাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার শুধু শিশুর সেই সোনার ভিম
পাড়া হাঁসের গল্পটির কথা মনে পড়ে।

সোনা মনিরা, তোমরা তোমাদের আবুকে দেখে রেখে।

তোমাদের আবু।

টুটপ চিঠি পড়া শেষ, করতাই রনু জিজ্ঞেস করল, 'শিশুর গল্পটা কী আশু?'

টুটপ বলল, 'তুই জানিনা না?'

'না।'

টুটপ চোখ বড় বড় করে বলল, 'গল্পটা হচ্ছে এরকম- একজনের একটা
রাজহাস ছিল সেটা প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ভিম পাড়ত। সেই মানুষটা
ভাবল, প্রত্যেক দিন একটা সোনার ভিম দিয়ে কী লাভ? তার থেকে হাঁসের পেট
কেটে একবারে সবগুলো সোনার ভিম বের করে নিই! লোভে পড়ে সে হাঁসের পেট
কেটে দেখে সেখানে কোনো ভিম নেই! তার তখন একবারে মাঝায় হাত।'

রনু অবাক হয়ে বলল, 'একবারে বাংলাদেশের মতো? একটু একটু করে
অনেক দিন গ্যাস ব্যবহার না করে একবারে সব গ্যাস বিক্রি করে দেওয়া।'

'হ্যাঁ।' আশা শ্রান মুখে হাসার চোঁটা করে বললেন, 'তবু একটা পার্থক্য।'

'কী পার্থক্য?'

'হাসিটা যে কেটেছিল সেই ছিল হাসিটার মালিক। বাংলাদেশের গ্যাসের মালিক
ছিল দেশের মানুষ, তারা কিন্তু কখনোই গ্যাস রপ্তানি করতে চায়নি। বিদেশী
গ্যাসের কোম্পানি আর দেশের কিছু মন্ত্রী মিলে গ্যাস রপ্তানি করেছে।' আশা একটা
নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'প্রায় ৩০ বছর আগের কথা, আমি ভবন বুব ছোট।
তবেই যে নির্বাচনের আগে তারা গ্যাস রপ্তানি নিয়ে একটা কথাও বলেনি কিছু
নির্বাচনে জেতার পরের দিন থেকেই তারা গ্যাস বিক্রি করার কাজে লেগে
গিয়েছিল।'

'কেন আশু?'

'প্রায় ৩০ বছর আগের কথা- আমি ভালো করে জানি না। যতটুকু তখনই
দেশের মানুষ, এম্পার্ট, ছাত্র-শিক্ষক সবাই বলেছিল দেশের জন্য ৫০ বছরের
গ্যাস মজুত রেখে তার থেকে যেটুকু বেশি সেটা রপ্তানি করতে। সব মিলিয়ে খুব

বেশি হলে ১০-১২ বছরের মতো গ্যাস মজুত ছিল। নতুন গ্যাস খুঁজে পাওয়ার আগেই বিদেশী কোম্পানিগুলো কী বোঝান কে জানে গ্যাস রক্তানি শুরু করে দিল।’

‘আর গ্যাস পাওয়া যায়নি?’

‘অল্প কিছু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের নিজের গ্যাস কোম্পানীকেও সুযোগ দেয়নি- তারাও কিছু করতে পারেনি।’

‘গ্যাস বিক্রি করে টাকা আদায়নি?’

‘নিশ্চয়ই এসেছে। সেই টাকা সবাই নুটেপুটে খেয়েছে। সেজন্যই তো গ্যাস বিক্রি করতে এত উৎসাহ ছিল। এর আগেও দেশের পরিবহন মানুষের জন্য বিলিফ এসেছে, সাহায্য এসেছে কিন্তু কখনোই লাভগামতো পৌছায়নি। আগেই অন্যান্য নুটেপুটে খেয়ে ফেলেছে।’

‘টুটল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আমাদের দেশে ভালো মানুষ নাই আশু?’

‘আছে। কিন্তু তারা তো আর রাজনীতি করে না। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে, ভালো মানুষেরা যখনই রাজনীতি করতে গিয়েছে হয় তাদের মেরে ফেলেছে, না হয় রাজনীতি করতে দেয়নি।’

‘কনুও এবারে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। ‘আমরা বললেন, ‘তাড়াতাড়ি শেতে আর, একটু পরেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে।’

‘সূর্য চলে পড়ছে, একটু পরেই যখন সূর্য ডুবে যাবে তখন সারা দেশ অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেশের প্রায় পুরো ইলেকট্রিসিটিই আসত গ্যাস জেনারেটর দিয়ে। ২০ বছর আগে যখন দেশের গ্যাস ফুরিয়ে গেল তখন একটি একটি করে সবগুলো জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেল। এখন এই দেশে আর কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, অল্প মেট্রিক তৈরি হয় দেশের বড়লোকেরা, মন্ত্রীরা, গভয়াদাররা, বিদেশী কুটনীতিকরা ব্যবহার করে।’

‘টুটল আর কনু খেতে বসল। অল্প কয়টি ভাত, কিছু আলু সেদ্ধ, একটি ডিম দুই ভাগ করে দুইজন। সঙ্গে কিছু মটরগুটি। টুটল জিজ্ঞেস করল, ‘আশু ছুটি খাবে না?’

‘তোরা খা, আমার খিদে নেই।’

‘তুমি তো কলারকে চিকিৎসা করে আওনি, আশু।’

‘আমরা তো বড় হয়ে গেছি তাই আমাদের এত খিদে পায় না। তোরা তো বাড়ন্ত তাই তাদের খালো করে খাওয়া দরকার।’

‘কনু বলল, ‘ও।’ ছোট বসে সে বুঝতে পারল না যে, আসলে খাবার নেই বলে আশু খাচ্ছেন না। টুটল তার খাবার প্লেটের দিকে তাকিয়ে ধলল, ‘তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন কী বাংলাদেশে খাবার ছিল?’

অতীতের কথা স্মরণ করে আশুর চোখ হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু হেসে বললেন, ‘এক সময় বাংলাদেশ খাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ইলেকট্রিসিটি দিয়ে পানির পাম্প আর সার কারখানা চলত। সেই পানি আর সার দিয়ে চাষাবাদ হতো। এখন গ্যাস নেই, তাই ইলেকট্রিসিটি নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই তাই পানি নেই। পানি নেই তাই চাষাবাদ নেই। চাষাবাদ নেই তাই খাবার নেই। প্রথম যখন দুর্ভিক্ষ হলো-’ আশা হঠাৎ করে থেমে গেলেন।

‘টুটল জিজ্ঞেস করল, ‘তখন কী হয়েছিল আশু?’

‘আমরা হাত নেড়ে বললেন, ‘খাক সেসব কথা তখন লাভ নেই।’

‘কেন আশু? বলো না তুমি।’

‘আমরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘দেশের গ্যাস যখন ফুরিয়ে গেল তখন হঠাৎ করে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেল, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, খাবার নেই, চাকরি নেই, গ্যারে কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই- হঠাৎ করে পুরো দেশ যেন মুখ বুজে পড়ে গেল। দেশের মনে হয় অর্ধেক লোক না খেয়ে মরে গেল। পথে-ঘাটে মানুষ মরে থাকত- কী ভয়ঙ্কর অবস্থা।’

‘কনু খাওয়া বন্ধ করে তার মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘তারপর কী হলো আশু?’

‘দেশে তখন বড় বড় দাঙ্গা হলো। সরকার অচল হয়ে পড়ল। ১৫ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে নিয়ে দেশ চালানো অসম্ভব একটা ব্যাপার। একের পর এক সরকার আসে আর যায়; কেউ দেশকে টেনে নিতে পারে না। চাষাবাদ নেই, কল-কারখানা নেই, কুল-কলমেই নেই- কেমন করে দেশ চলবে? তখন মিলিটারিরা এল শাসন করতে। তারা এসে দেশের কিছু মন্ত্রী, কিছু বড়লোক, কিছু বিদেশীদের প্রতীকশন দিয়ে পুরো দেশের কথা ভুলে গেল। এখন পুরো দেশ চলছে নিজের মতো। কোনো নিয়মকানুন নেই, কোনো আইন নেই। এক একটা এলাকা চাষায় এক একটা মাছানা। এক একটা গভয়াদার।’

‘টুটল জিজ্ঞেস করল, ‘আমরা যখন বড় হব তখন কী হবে আশু?’

‘আমরা খুব ইচ্ছে করল একটি আশার কথা বলবেন, একটি সাহসের কথা বলবেন, কিন্তু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। প্রায় ৩০ বছর আগে যখন নতুন সহস্রাব্দ শুরু হলো তখন সারা পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির একটি জোয়ার এসেছিল। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরাও কত আশা আর স্বপ্ন নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে শুরু করল। যখন দেশের অর্থনীতির বেদনগুটি পুরোপুরি ভেঙে গেল তখন পড়াশোনার ব্যাপারটি ধীরে ধীরে উঠে গেল। যারা বড়লোক ও শুধু তারা পড়াশোনা করতে পারে, যারা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের পড়াশোনার সুযোগও আছে আছে পুরোপুরি উঠে গেল। সরকার দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না, কেমন করে পড়াশোনা করাবে? শুধু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে লাখ লাখ টাকা দিয়ে বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে, পড়াশোনা শেষ করে তারা দেশে ফেরে চলে যায়। এখন বাংলাদেশ হচ্ছে আশপাশ, ভরসাহীন, স্বপ্নহীন মানুষের দেশ।’

‘টুটল আবার জিজ্ঞেস করল, ‘কী হবে আমাদের আশু?’

‘ভালো করে পড়াশোনা কর বাবা, হয়তো কোনো ইউনিভার্সিটিতে ফ্লোরশিপ পাবি। হয়তো পড়াশোনা শেষ করে তোর বাবার মতো অন্য কোনো দেশে কাজ খুঁজে পাবি।’

‘টুটল স্থির চোখে তার আবার দিকে তাকিয়ে রইল। সূর্য ডুবে-ঘাওয়ার পর সবাই বিশ্রামে তাদের তারা-জানোলা বন্ধ করে দিতে শুরু করল। জানালা বন্ধ করার

আগে আমরা একবার বাইরে তাকালেন। মানুষজন দ্রুত ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। যতদূর দেখা যায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি। কোথাও একটি গাছ নেই। সব গাছ কেটে ছুলিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা অনেকদিন ঘর থেকে বের হন না, সেদিন শহরের মাঝে গিয়েছিলেন। প্রাক্তর মোড়ে একটা ব্বরের কাগজ লাগিয়ে রেখেছে। অনেক মানুষের সঙ্গে আমরাও সেটি মানিক্ষণ পড়লেন। সারা বাংলাদেশে নাকি কোথাও কোনো গাছ নেই। সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পুরো দেশ নাকি, একটি মরুভূমির মতো। আখার মনে পড়ল মাত্র ৩০ বছর আগেও এই দেশে কত গাছ ছিল, বর্ষার শুরুতে যখন সব গাছের পাতা ধূয়ে মুছে ঘন সবুজ হয়ে উঠত তখন দেখতে কী সুন্দরই না লাগত। আমরা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানালা বন্ধ করে দিলেন। একটু পরেই সারা দেশ গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টুটুল আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায় সে উঠে বসল। সে বলল, 'আমু, তুমি ঘুমিয়ে গেছো?'

'না, বাবা। কী হয়েছে?'

'যে মন্ত্রীরা আমাদের দেশের গ্যাল বিক্রি করে দিয়ে দেশের এরকম অবস্থা করেছে, তাদের ছেনেমেয়ে ছিল না?'

'ছিল।'

'তারা এখন কেমন আছে?'

আমু আনন্দহীন এক ধরনের হাসি হাসলেন, হেসে বললেন, 'তারা কী এই দেশে আছে নাকি বোকা ছেলে? গ্যাস বিক্রির টাকা নিয়ে তখনই তারা সবাই আমেরিকা চলে গেছে। তাদের ছেনেমেয়েরা খুব ভালো আছে সেই দেশে।'

এক ধরনের অসহায় আক্রোশ দিয়ে ১২ বছরের একটি কিশোর অন্ধকার ঘরে নিদ্রাহীন চোখে বসে থাকে। ভোরবেলা সূর্য ওঠার পর এই অন্ধকার কেটে যাবে কিন্তু তার জীবনের অন্ধকার কি কাটিবে কখনো?

এটি একটি কাল্পনিক গল্প এবং আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, এটি কখনোই সত্যি গল্প হবে না— এটি কাল্পনিকই থেকে যাবে। এ দেশের গ্যাস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এর মালিক হচ্ছে বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষ। কিছু বিদেশী তেল কোম্পানির লোভের মূল্য জোগানোর জন্য এই দেশে সরকার নিশ্চয়ই দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেবে না।

ভবিষ্যতের টুটুল আর রশ্মদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের জীবন থেকে শতগুণ আনন্দময় হবে, সহস্রগুণ স্বপ্নময় হবে এবং সেটি করে তোলায় দায়িত্ব আমাদের সবার।

একম অঙ্গল

২৬ মে ডিসেম্বর ২০০২